

পরিচয়

আশ্বিন, ১৩৬৯

প্রচ্ছদ :
পরিতোষ সেন

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদকীয়

ভারতের উত্তর সীমান্তে বান্দুং সম্মেলনের মহৎ অঙ্গীকার সমাধিস্থ হয়েছে। চীনা বাহিনীর আক্রমণে ভারতের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা আজ বিপন্ন। বলপ্রয়োগে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের এই নীতিবিগর্হিত প্রচেষ্টাকে আমরা তীব্রতম ভাষায় নিন্দা করি।

এতদিন আমরা বিশ্বাস করে এসেছিলাম যে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সীমানাকে কোনো যুক্তিতেই লঙ্ঘন করা চলে না। আজ যখন বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিটি টলে উঠেছে তখন বিশ্বাসের বদলে ঘৃণা নিয়ে আমরা ঘোষণা করছি, এই সর্বনাশের মূলকে আমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে পরাভূত করব। যে উদার গণতন্ত্র রূপায়নের জন্যে আমাদের দেশের জনসাধারণ আত্মত্যাগ করেছেন, যে সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্যে তাঁদের প্রয়াস, যে জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির প্রতি তাঁদের একান্ত সমর্থন—তাকে আমরা জীবনের চেয়েও বড়ো মূল্য দিয়ে এসেছি। আজ জীবন দিয়েই সেই মূল্যকে বাঁচাতে আমরা সর্বতোভাবে প্রস্তুত।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী জাতির এই সংকট-মুহূর্তে ঐক্যের আবেদন জানিয়েছেন। দেশের জনসাধারণেরও সেই দাবি। আমরাও সারা দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আহ্বানে আমাদের সমর্থন ও শপথ যুক্ত করছি। আমাদের উৎসাহ ও আমাদের সামর্থ্য দিয়ে দেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে আমরা সর্বতোভাবে সাহায্য করব।

আমরা আনন্দিত, বাংলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। চারটি স্বতন্ত্র বিবৃতিতে শতাধিক শিল্পী সাহিত্যিক সংস্কৃতিসেবী দেশরক্ষার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। আমাদের আবেদন, তাঁরা একসঙ্গে মিলিত হোন, দেশরক্ষার পবিত্র কর্তব্যে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করুন, ঐক্যবদ্ধ করুন।

ঐক্যের জন্যে সংগ্রাম, ঐক্যবিরোধী প্রয়াসের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম। আমরা লক্ষ্য করছি, শিল্পী-সাহিত্যিকদের দুই শিবিরে বিভক্ত করার,

দেশবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার এক সর্বনাশা চক্রান্ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমরা দেশের মানুষকে সচেতন করে তুলব। জাতীয় সংকটের দিনে যারা দেশবাসীকে বিভক্ত করে—সচেতনা সেই দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে। জাতীয় সংকটকে যারা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে—সচেতনা সেই সুযোগ-সন্ধানীদের বিরুদ্ধে। জাতীয় সংকটকে যারা প্রতিহিংসা চরিতার্থের হাতিয়ার করে—সচেতনতা সেই কাপুরুষদের বিরুদ্ধে। জাতীয় সংকটের সুযোগ নিয়ে যারা শতাব্দীব্যাপী সাধনার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে পদদলিত করতে চায়—সচেতনতা সেই মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে। আমাদের উদ্দীপিত চেতনার আগুনে মহৎ শুদ্ধতার জন্ম হোক।

আমরা এ-যুদ্ধ চাই নি। আমরা ভারতবাসী শান্তিপ্রিয়, দুশো বছরের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-শাসনে বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে রত ছিলাম। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এ-যুদ্ধ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু ভারত সরকার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ বন্ধ করেন নি। তাঁরা বলেছেন, চীনারা ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের সীমারেখায় ফিরে গেলে যুদ্ধ-বিরতি হতে পারে, শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত-সমস্যার সমাধানের প্রয়াস করা যেতে পারে। আমরা মনে করি, এ প্রস্তাব অতি যুক্তিপূর্ণ। সম্মানজনক শর্তে সীমান্ত-সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান আমাদেরও কাম্য। নইলে অবশ্যই দীর্ঘকালীন যুদ্ধের জন্যে আমরা প্রস্তুত।

আর্য ও অনার্য

নৃপেন গোস্বামী

মৃত্যুর প্রাক্কালে প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ অল্টেকার হরপ্পা-আর্য সমস্যার উপর নূতন আলোকপাত করেছিলেন কয়েকটি মন্তব্যের ভিতর দিয়ে। তাঁর মতে আর্যেরা যখন ভারতে প্রবেশ করেন, তখনও হরপ্পা সভ্যতার বাতিটি জ্বলছে, কয়েক শতাব্দী ধরে হরপ্পা ও বৈদিক সংস্কৃতি পাশাপাশি বিরাজ করেছে এবং পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে, এই সময়টা হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ২০০০ থেকে ১৫০০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত পাঁচ শত বৎসর। হরপ্পাবাসীরা অসামরিক জনগোষ্ঠীরূপে বিবেচিত হতে পারে না, তাদের সঙ্গে বৈদিক আর্যদের শক্তি-পরীক্ষা হয়েছে অনেকবার এবং উভয়ের মধ্যেই জয়-পরাজয়ের বিনিময় হয়েছে। ঋগ্বেদে উল্লিখিত পণিরাই হচ্ছে হরপ্পাবাসী, তারা ছিল দক্ষ ব্যবসায়ী, অযাজক ও দেবতাবিহীন। তাদের কিছু অংশ ধীরে ধীরে বৈদিক ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে এরূপ আভাস পাওয়া যায় কোনো কোনো ঋক্‌মন্ত্রে।

পণি ও হরপ্পাবাসীর সমীকরণ সম্ভাব্য প্রকল্পমাত্র। ঋক্‌মন্ত্রের হরিয়ূপীয়ার সঙ্গে হরপ্পার সম্পর্কও কখনও কখনও অনুমিত হয়েছে।

পিগট বলেছেন যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর অধিবাসীরাই দাস বা দস্যুরূপে ঋগ্বেদে বিশেষিত হয়েছেন। এঁদের একাংশ ছিলেন কৃষ্ণকায় চেপ্টানাসা আদি-অস্ট্রেলীয় নৃবংশ-ভুক্ত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঋগ্বেদীয় দাস ও দস্যুকে দ্রাবিড়দের সঙ্গে সংযুক্ত করবার পক্ষপাতী। ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গতি রক্ষা হয়, যদি সিন্ধু উপত্যকাবাসীরা দ্রাবিড়-রূপে প্রতিপন্ন হতে পারেন। দ্রাবিড়েরা এককালে উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন এরূপ অনুমানের পক্ষে

বেলুচীস্তানের দ্রাবিড়ভাষী ব্রাহুইদের নিদর্শনটি অনেক সময়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এই প্রকল্প অনুসারে একটি পুরাতাত্ত্বিক আলেখ্য সম্পূর্ণতা লাভ করে। তা হচ্ছে এই যে সিন্ধুতীরবাসীরা ও দ্রাবিড় অভিন্ন গোষ্ঠী, তারাই আবার ঋগ্বেদোক্ত দাস ও দস্যু, তাদের সঙ্গেই আর্যদের প্রাথমিক সামরিক বোঝাপড়া, সমঝোতা, ও সাংস্কৃতিক বিনিময় হয়েছিল। আর্য ও অনার্যের প্রসঙ্গে অগ্রাধিকার লাভ করে হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টা ও ঋগ্বেদ-রচয়িতাদের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের ইতিকাহিনী।

হাটন (J. H. Hutton) দ্রাবিড় ভাষাভাষীকে সংযুক্ত করেছেন ভূমধ্য (Mediterranean) নৃবংশের সঙ্গে। কিন্তু ইদানীং শশাঙ্কশেখর সরকার দ্রাবিড়দের মধ্যে বেদ্দিদ দীর্ঘমুণ্ডীয় প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন, তাঁর মতে বেদ্দিদরাই নাকি ভারতের প্রকৃত আদিবাসী। আদি-অস্ট্রেলীয় ও বেদ্দিদের মধ্যে নৃবংশীয় সাদৃশ্যও রয়েছে। আদি-অস্ট্রেলীয়ের সঙ্গেও দ্রাবিড়ের সম্মিলন অনেকের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। দ্রাবিড়ের নৃবংশীয় সনাক্তকরণ এখন পর্যন্ত অসম্পূর্ণ। এদিকে আবার সিন্ধু উপত্যকার নৃবংশীয় উপকরণে অস্ট্রেলীয়, ভূমধ্য বংশীয় ও অ্যাল্‌পাইন বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়েছে। সুতরাং কোনো একটি নৃবংশীয় ধারার সহিত সিন্ধু সভ্যতাকে যুক্ত করার যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল এবং দ্রাবিড়কে সিন্ধু উপত্যকায় টেনে আনাও দুঃসাহসিক কল্পনামাত্র।

সমীকরণ

সংস্কৃত সাহিত্যে আর্য, ব্রাত্য, দ্রাবিড়, নিষাদ, কিরাত প্রভৃতি গোষ্ঠী-নাম দৃষ্ট হয়। এই নামগুলির নৃবংশীয় সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে।

অনেকেই বলেন যে আর্য শব্দের কোনো নৃবংশীয় দ্যোতনা ছিল না, আর্য কোনো জাতি নয়, পরন্তু একটি ভাষাভাষী বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। আর্যদের ভিতরে কোথাও কোথাও দীর্ঘমুণ্ডী নর্ডিক বৈশিষ্ট্য এবং কোনো কোনো অঞ্চলে গোলমুণ্ডী অ্যাল্‌পাইন বিশেষত্ব অনুমিত হয়েছে। ক্রোয়েবার ককেসীয় নৃবংশের ধারায় নর্ডিক, অ্যাল্‌পাইন ও হিন্দু এই তিন উপধারাকে পৃথক-রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ফন এইক স্টেড (Von Eickstedt) উত্তর ভারতীয় নৃবংশীয় বৈশিষ্ট্যকে ইণ্ডিড আখ্যা দিয়েছেন। হুটন (E. A. Hooton) উত্তর ভারতের নৃবংশীয় প্রবণতাকে ইন্দো-নর্ডিকরূপে বর্ণনা করেছেন। বিজয়চন্দ্র মজুমদার বাঙ্গালী, গুজরাটি, আইরিশ ও ফরাসীকে অ্যালপাইন ধারায় স্থাপন করবার পক্ষপাতী।

আর্য মানে শুধু বৈদিক জনতাই নয়, অবৈদিক ব্রাত্যেরাও জিমার, চন্দ প্রভৃতি কর্তৃক আর্য-রূপে গণ্য হয়েছে। আর্যাবর্তের আর্য ও বহির্বৃত্তের আর্যের মধ্যে তফাৎ করা হয়েছে। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাত্যেরা ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারা নাকি অ্যালপাইন নৃবংশের অন্তর্ভুক্ত—এই জাতীয় প্রকল্পের প্রতি অনুরাগ দেখিয়েছেন কেউ কেউ।

প্রকৃতপক্ষে আর্যেরা দ্রাবিড়ের মতোই সাংস্কৃতিক বা ভাষাভাষী গোষ্ঠী। এদের উভয়ের মধ্যেই বিশেষ নৃবংবশীয় ঝোঁক আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু কোনো নৃবংশে অন্তর্ভুক্তি নিছক কাল্পনিকতা-প্রসূত। ব্রাত্য নামটিও গোলমেলে। অবৈদিক আর্য ব্যতীত অনার্য-গোষ্ঠীও মনুস্মৃতিতে ব্রাত্য-রূপে কথিত হয়েছে।

বেদোক্ত নিষাদেরা হচ্ছে আদি-অস্ট্রেলীয় এই মত পোষণ করেছেন বি. এস. গুহ প্রভৃতি।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কিরাত ও ইন্দো-মঙ্গোলীয়ের সমীকরণ সমর্থন করেছেন। কিরাতেরা মঙ্গোলীয় হতে পারে, কিন্তু মঙ্গোলীয় মাত্রই কিরাত নয়। মনুসংহিতায় চীন ও কিরাতের একত্র পৃথক উল্লেখ দেখা যায়। [মনু ১০।৪৪]

নৃবংশীয় সিদ্ধান্ত মাত্রই অনিশ্চয়তার উর্ধ্বে উঠতে পারে না। গর্ডন চাইল্ড, টয়েনবী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা নৃবংশীয় বিভাগগুলিকে উচ্চ মর্যাদা দিতে চান নি এবং এ বিষয়ে তাঁদের অভিমত উপেক্ষনীয় নয়। ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নৃবংশের যোগসাজস ধরে নেওয়াও বিপজ্জনক। মঙ্গোলীয় প্রবণতা-যুক্ত আসামের খাসিয়া অষ্ট্রিক শাখার মন্‌-খমের ভাষায় কথা বলে, অথচ অষ্ট্রিক হচ্ছে মোটামুটিভাবে আদি-অস্ট্রেলীয়ের ভাষা। আবার, বেলুচীস্তানের ব্রাহুইরা তুর্কো-মঙ্গোল-বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়েও দ্রাবিড় ভাষাভাষী। ওরাওঁরা আদি-অস্ট্রেলীয়, কিন্তু দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহার করে। ভাষা ও সংস্কৃতি অনেক সময়ে এক গোষ্ঠী থেকে ভিন্ন গোষ্ঠীতে সঞ্চারিত হয়। সাংস্কৃতিক ব্যাপারে মৌলিক উপকরণ ও ঋণের পরিমাণ নির্ণয় করা সহজ নয়, যেহেতু বিশুদ্ধ সংস্কৃতি হচ্ছে বিশুদ্ধ নৃবংশের মতোই অলীকবস্তু। [pp. 52-55, *A stndy of history*, Toyanbee, 1951]

সংস্কৃত গ্রন্থ-গত গোষ্ঠী-নামের সঙ্গে অধুনা-দৃষ্ট গোষ্ঠী বা নৃবংশীয় ধারার একীকরণ সর্বদাই বাধা-সঙ্কুল। শবর, পুলিন্দ, নিষাদ, কিরাত প্রভৃতি নাম বৈদিক সাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হয়। এ সকল নাম যে অনার্য কৌমের সূচক

এ বিষয়ে আমরা সন্দেহ করতে পারি না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আর একটু অগ্রসর হয়ে একালের কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে সমীকরণের যুক্তি নিতান্তই কল্পনা-কণ্টকিত।

শবরের কথাই ধরা যাক। শবরের সদৃশ শম্বর-নামটি ঋগ্বেদীয়। ঋক্‌মন্ত্র অনুসারে একজন শম্বর হচ্ছেন ইন্দ্রের শত্রুপক্ষীয় এবং দাস-রূপে অভিহিত। বর্তমান সম্বলপুরের একটি কৌমের নামও শম্বর, আবার একথাও বলা যায় যে শম্বর-অধ্যুষিত অঞ্চল হয়েছে সম্বলপুর। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হয়েছে শবর এবং উড়িষ্যাবাসী শবরের সংবাদ পাওয়া যায়। বর্তমান নাম ও অতীত নামের এই মিল হয়তো নিরর্থক নয়, কিন্তু সমীকরণে বাধাও রয়েছে প্রচুর।

অথর্ব বেদের আমলে যে কৈরাতিকা কুমারিকা ভেষজ খনন করতেন, তাঁর সঙ্গে কাছার-বাসী কিরাতের কোনো সম্পর্ক থাকা কি সম্ভব? [অথর্ব ১০।৪।১৪]

শতপথ ব্রাহ্মণের প্রজাপতি-পুত্র দেব-বৈরী অসুর, ছোটনাগপুরের অসুর কৌম, আসিরিয়ার অসুর বাণিপাল প্রভৃতি রাজাগণ, কামরূপের বর্মণ রাজবংশীয় নরকাসুর প্রভৃতির প্রতি যুগপৎ আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু এতগুলি বিকল্পের মধ্যে সমীকরণের পথ কোথায়?

মহাভাষ্যে দেখতে পাচ্ছি অসুরদের পরাজয় ঘটছে ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকবার জন্য। তারা "হে অরয়ঃ" উচ্চারণের পরিবর্তে "হে অলয়ঃ" এই অপভাষা প্রয়োগ করে, সুতরাং ম্লেচ্ছ-পদ-বাচ্য। ম্লেচ্ছ না হওয়া যেহেতু বাঞ্ছনীয়, সেইহেতু ব্যাকরণ পড়া কর্তব্য—এই উপদেশ দিয়েছেন পতঞ্জলি। [১।১।১]

এস্থলে অসুরেরা ম্লেচ্ছ-রূপে নিন্দিত হয়েছেন। তাঁরা অশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন, দ্রাবিড় ভাষা কিংবা অস্ট্রিক ভাষা ব্যবহার করেন না। এই অসুরেরা কি দ্রাবিড় কিংবা আদি অস্ট্রেলীয় কিংবা আসিরীয়-রূপে বিবেচিত হতে পারেন? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর নেই, যদিও সাধারণভাবে অসুর ও অনার্যের সমীকরণে কোনো বাধা দেখছি না।

অসুরকে আসিরীয়-রূপে গণ্য করেছেন আর. জি. ভাণ্ডারকর, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং আরও অনেকে। আসুর বিবাহ প্রসঙ্গে এই সমীকরণ সমুচিত হলেও সর্বত্র সমর্থনীয় নয়। বৈদিক আমলের শেষ পর্যায়ে অনার্যমাত্রেই অসুর-রূপে পরিচিত হয়েছেন। [pp. 89-90, *Evolution of ancient Indian law*, N C. Sen Gupta, 1953]

আর্য ও দাস

ঋগ্বেদে দাস ও আর্যের একত্র উল্লেখ দেখা যায়। যারা আর্য নয় তারাই সম্ভবত দাস-পদ-বাচ্য। দাস ও আর্যের পার্থক্য না থাকলে একমন্ত্রে আলাদাভাবে উভয়ের উল্লেখ হয় অর্থহীন। [দাসস্থ বা আর্য্যস্থ বা—ঋ ১০।১০২।৩]

একটি ঋক্ মন্ত্র অনুসারে ইন্দ্র দাস বর্ণকে অভিভূত করেন। আর একটি মন্ত্রের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, ইন্দ্র দস্যুগণকে হত্যা করে আর্য বর্ণকে রক্ষা করেন।

এস্থলে বর্ণ-শব্দের তাৎপর্য গাত্র-ত্বক্‌কে নির্দেশ করছে, জন্ম-গত জাতকে (Caste-কে) নয়। গাত্র-বর্ণের দিক দিয়ে আর্য ও দাসের তফাৎ সূচিত হচ্ছে। [দাসম্ বর্ণম্—ঋ ২।১২।৪ ; হত্বী দস্যূন্ প্র আর্যং বর্ণম্ আবৎ—ঋ ৩।৩৪।৯]

অথর্বমন্ত্রে আর্য ও শূদ্রের পৃথকীকরণ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অর্থাৎ আর্যেতর মানুষেরা শূদ্র-রূপে বিবেচিত হয়েছেন। [যশ্চ শূদ্রঃ উত আর্য্যঃ—অথর্ব ৪।২০।৪ ; উত শূদ্রম্ উত আর্য্যম্—৪।২০।৮]

পুরুষসূক্তের বর্ণনা অনুসরণ করে আমরা দেখতে পাই যে পুরুষের পদযুগল থেকে শূদ্রের উৎপত্তি কল্পিত হয়েছে। এ ধরনের কল্পনায় শূদ্রের সেবাবৃত্তি বা গোলামী (slavery) হয়েছে বিবেচনার বিষয়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দাস হচ্ছে গোলাম, শূদ্রও গোলাম। আর্যকুলে জাত ব্যক্তিও কখনও কখনও শূদ্রের, অর্থাৎ, গোলামের কাজে নিযুক্ত হয়ে থাকেন। আর্যপ্রাণ শূদ্রেরা কৌটিল্যের আমলে আবির্ভূত হয়েছেন। [৩।১৩]

মনু সাতপ্রকার দাস বা গোলামের কথা বলেছেন। [৮।৪১৫]

কৌটিল্য বা মনু গোলামকেই দাসরূপে গণ্য করেছেন। কৌটিল্য শূদ্র ও গোলামের মধ্যেও তফাৎ করেন নি।

এই সূত্র ধরে কি বলা যায় যে শূদ্র ও দাস-শব্দের বৈদিক তাৎপর্যও হচ্ছে গোলাম? বৈদিক আমলে অনার্য গোষ্ঠীগুলি থেকে ধৃত ব্যক্তিরাই গোলামের কাজ করতে বাধ্য হতো, সুতরাং তারা ছিল দাস কিংবা শূদ্র-পদ-বাচ্য। আর্যেরা গোলামের কাজ করত না, তাই তারা দাস বা শূদ্র-রূপে গণ্য হতো না।

এ জাতীয় প্রকল্প গৃহীত হলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে আর্যেরা ছিলেন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা রাজন্য এবং বৈশ্য। অনার্যেরা

ঋগ্বেদে দাস বা দস্যু-রূপে এবং অথর্ব বেদে শূদ্র-রূপে কথিত হয়েছেন। ডি. আর. ভাণ্ডারকর প্রভৃতি এই সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী। [pp. 14-15, *Some aspects of ancient Indian culture*, 1940]

দাস ও দহ

ইরাণীয় ভাষায় দহ ও দহ্যু এই দুইটি শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দহ হচ্ছে সংস্কৃত দাসের প্রতিরূপ, দহ্যু ও সংস্কৃত দস্যু অবিকল একরকমের শব্দ।

দহ হচ্ছে কৌম-নাম।

আবেস্তার হোম-যস্ত অনুসারে অঝি দহাক হচ্ছেন একটি সর্প, অর্থাৎ, সাপ-টটেম-ধারী কোনো শত্রু-কৌমের নায়ক। তিনি ইরাণীয়দের গেথ, অর্থাৎ, বসতি-সমূহ ধ্বংস করলেন। তখন তাঁকে ঘায়েল করলেন ইরাণীয় নায়ক থে্তন। [৯।৭]

ঋগ্বেদেও দেখছি জবরদস্ত ইন্দ্র অহিকে নিধন করছেন। আবেস্তার অঝি (Azhi) এবং বৈদিক অহির মধ্যে কোনো তফাৎ দেখছি না। [ঋ ২।১২।১১]

আবেস্তীয় দৈঙ্হু প্রাচীন পারসীকে হয়েছে দহ্যু। দৈঙ্হু দেশ-বাচক। কিন্তু প্রাচীনতর তাৎপর্য কৌম হতে পারে।

ইরাণীয় নিদর্শন যদি উপেক্ষিত না হয়, তাহলে ঋগ্বেদীয় দাস ও দস্যুকে বৈরী-কৌম-রূপে গণ্য করতে বাধ্য হই আমরা। সম্ভবত গ্রীক 'বর্বর' (barbaros) আখ্যার সঙ্গে তুলনীয় দাস বা দস্যু। অ-গ্রীকরা যেমন বর্বর-রূপে কথিত হতো, তেমনি অনার্য গোষ্ঠীমাত্রই ঋগ্বেদীয় আমলে দাস বা দস্যু-রূপে আখ্যাত হতো।

আদি বৈদিক পর্বের অনার্যেরা সম্ভবত সিন্ধু উপত্যকাবাসীরাই, তারাই দাস ও দস্যু বিশেষণের লক্ষ্যস্থল হতে পারে। কিন্তু তারা যে দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত এমন কথা জোরের সঙ্গে বলবার কোনো সূত্র নেই।

দাস-প্রবর্গ

ঋগ্বেদে অন্তত একটি জায়গায় দাস-শব্দের অর্থ হচ্ছে গোলাম। উষস্ দেবীর নিকটে প্রার্থনা করা হচ্ছে রয়ি বা ধন। ধনের নমুনাস্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে সুবীর এবং দাস প্রবর্গ। বীর, অর্থাৎ, পুত্রসন্তান এবং কয়েকটি দাস বা

গোলাম যেখানে কামনার বিষয় হতে পারে, সেই সমাজে গোলামী প্রথা না থেকে পারে না। [ঋ ১।৯২।৮]

সায়ণ দাস-প্রবর্গের অর্থ করেছেন অনেকগুলি কর্মকর বা ভৃত্য।

সমৃদ্ধ গৃহস্থালীতে সম্পত্তি-রূপে বিবেচিত হতো পুত্র এবং গোলামেরা ঋগ্বেদীয় পর্বেই।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দাস-পুরুষ গোলামের তাৎপর্য বহন করছে। ধনী বিশ্, অনেক দাস-পুরুষের মালিক হতে পারতেন। এস্থলে গোলামের মালিকের ছবি ফুটে উঠছে। [তৈ ব্রা ৩।৮।৫]

ঈদৃশ নিদর্শনে একটি ধারণার উপযোগী উপকরণ মিলছে। অনার্য কৌমের লোকেরা দাস-রূপে পরিচিত হতো বৈদিক সমাজে, আবার গোলামকেও বলা হতো দাস। গোলামীতে নিযুক্ত হতো যুদ্ধ বন্দী অনার্যেরা, তাই তারা 'দাস' আখ্যা লাভ করত।

দাসী-পুত্র ও শূদ্রাপুত্র

ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের আখ্যায়িকা থেকে জানা যায় যে দাসী-পুত্র হওয়ার দরুন কবষ অবহেলিত হয়েছেন। "তুমি দাসীর পুত্র, সুতরাং তোমার সঙ্গে আমরা যাব না"—একথা কবষকে বলছেন তাঁর সঙ্গীরা। [শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ ১২।৩ ; ঐ ব্রা ২।৩।১]

বিগর্হণের বিষয়ীভূতা দাসী কে হতে পারেন ? ইনি অনার্যগোষ্ঠী থেকে গৃহীত স্ত্রী গোলাম ছাড়া আর কেউ নন। এঁর উপর ন্যস্ত হতো গোলামীর বৃত্তি এবং উপপত্নীর মর্যাদা। উপপত্নীর সন্তানেরা সমাজে ছিলেন অপাংক্তেয়।

কোথাও কোথাও আমরা শূদ্রাপুত্র ও অসুরীপুত্রের সাক্ষাৎ পাই। শূদ্রা ও অসুরীও অনার্য স্ত্রী গোলাম-রূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। তিনিও উপপত্নীর পদে আসীনা।

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে বৎস কাণ্ব শূদ্রা-পুত্র-রূপে নিন্দিত হয়েছেন। যেহেতু তিনি শূদ্রার পুত্র, সেই কারণে মেধাতিথি তাঁকে অব্রাহ্মণ-রূপে ভর্ৎসনা করেছেন। অথচ, উভয়েই এক বাপের সন্তান। এতে বোঝা যায় যে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র সামাজিক মর্যাদা পেত, উপপত্নীর পুত্র লাভ করত সামাজিক অবহেলা।

বৎস অন্যত্র ত্রিশোক-রূপে পরিচিত হয়েছেন। একজনের দুই নাম থাকা বিচিত্র নয়। এক্ষেত্রে তিনি বর্ণিত হয়েছেন অসুরী-পুত্র-রূপে।

এইসব বিবরণ থেকে স্ফুট হচ্ছে যে যিনি দাসী-রূপে গণ্য, তাঁকেই কখনও শূদ্রা-রূপে, কখনও বা অসুরী-রূপে বর্ণনা করা হয়। দাসী, শূদ্রা ও অসুরী অনার্যও বটে, স্ত্রী গোলামও বটে। অনার্য পুরুষ ধৃত হয়ে গোলামের কাজ করে। অনার্য স্ত্রীলোক বন্দিনী হয়ে গোলামীর সঙ্গে উপপত্নীর বৃত্তিও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে বৈদিক সমাজে আর্যরক্তের নর-নারী গোলামীর কাজ করত না, অনার্য বন্দী ও বন্দিনীরাই এরূপ কাজে নিযুক্ত হতো। দাসী, শূদ্রা ও অসুরী একই সামাজিক পরিচয়ের সূচক এবং তিনটি প্রতিশব্দ। এই শব্দগুলিকে একসঙ্গে বিবেচনা করলে অনার্য রমণীর দাস্য-দশা প্রতিভাত হয়। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে যে বিচার সঙ্গত তা পুরুষের প্রতিও প্রযোজ্য। কোনো এক সময়ে দাস ও শূদ্র অনার্য পুরুষের প্রতিপাদক ছিল এবং তার গোলামীকেও সূচিত করত। [প ব্রা ১৪।৬।৬ ; জৈ ব্রা ৩।১৮, ২৩৫]

উপপত্নী প্রথা—Concubinage

ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের দাসীপুত্র ও শূদ্রাপুত্রেরা বৈদিক সমাজে উপপত্নীপ্রথার অস্তিত্ব দেখিয়ে দিচ্ছেন।

আর্য ও অনার্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংযোগ ঘটবার ফলে গোলামী ও উপপত্নী-প্রথার উৎপত্তি হয়েছিল বলে মনে হয়।

স্মৃতিশাস্ত্রের নজীর যদি বৈদিক আমলের উপরেও অন্তত আংশিকভাবে প্রযোজ্য হয়, তাহলে উপপত্নী-প্রথার বিষয়ে আমরা অস্পষ্ট ধারণায় পৌঁছতে পারি।

বিষ্ণু বলছেন—দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ধর্মপালনের উদ্দেশে শূদ্রাকে ভার্যা-রূপে গ্রহণ করতে পারেন না, কিন্তু রতির প্রয়োজনে তার সঙ্গ নিষিদ্ধ নয়। [বিষ্ণু, ২৬।৫]

মনুর মতে শূদ্রাকে বৈধভাবে শয়ন-সঙ্গিনী করা চলে না। যদি কখনও অবৈধভাবে শূদ্রা-সঙ্গম ঘটে, সেক্ষেত্রে শূদ্রা-পুত্র ঋকৃথ, অর্থাৎ, পৈতৃক ধন থেকে বঞ্চিত হবেন। [মনু, ৩।১২, ১৩, ১৭ ; ৯।১৫৫]

আর্য পুরুষ ও অনার্য নারীর সন্তান আর্য-রূপে পরিচিত হতে পারে, কিন্তু অনার্য পুরুষ ও আর্য স্ত্রীলোকের সংশ্রবের ফলে উৎপন্ন সন্তান গণ্য হবে অনার্য-রূপে। [মনু ১০।৬৭]

মনু যে সমাজের চিত্র তুলে ধরছেন আমাদের সামনে, সে সমাজে অনুলোম (hypergamy) যৌন সম্পর্ক সমর্থিত হতো, কিন্তু প্রতিলোম (hypogamy) যৌন সম্বন্ধের কোনো সমর্থন মিলত না। অর্থাৎ, উচ্চবর্ণের পুরুষ মিলিত হতে পারতেন নীচবর্ণের নারীর সঙ্গে, কিন্তু এর বিপরীত রীতি ছিল নিন্দিত। এই নিয়ম অনুসারে আর্য পুরুষ ও অনার্য নারীর সঙ্গম অনুমোদিত হয়েছে, যদিও এদের সন্তান উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতো।

আর্যসমাজে উপপত্নী-প্রথার প্রচলন ছিল অনুমান করতে পারি। কিন্তু এর ব্যাপকতা কি পরিমাণে ছিল তা আন্দাজ করা যায় না। শূদ্রা ভার্যা যে নিছক রতির প্রয়োজনে বিহিতা ছিল একথা মহাভারতেও বিবৃত হয়েছে। অনেকে এই প্রথা অনুমোদন করতেন, অনেকে করতেন না। বশিষ্ঠ-প্রদত্ত পুত্র-তালিকায় নিতান্ত হীন স্থান নির্ধারিত হয়েছে শূদ্রাপুত্রের নিমিত্ত। কামসূত্রের বিধানে স্ববর্ণে নর-নারীর 'কাম' হচ্ছে প্রশস্ত, উত্তমবর্ণা নারীতে অধমবর্ণের পুরুষের ভালোবাসা নিষিদ্ধ, কিন্তু নীচবর্ণের নারী ও উচ্চবর্ণের পুরুষের ভালোবাসা শিষ্টাচার নয় কিংবা নিষিদ্ধও নয়। [মহা ১৩।৪৪।১২, ১৩ ; বশিষ্ঠ, ১৭ অ ; কামসূত্র ১।৫]

শূদ্রের গোলামী

পুরুষসূক্তে পুরুষের পদযুগল থেকে শূদ্রের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। এস্থলে শূদ্রের নিম্নতম সামাজিক মর্যাদা বোঝা গেলেও অনার্যত্ব পরিষ্কার নয়।

অথর্ববেদে আর্য ও শূদ্রের পৃথকীকরণে শূদ্রের অনার্যত্ব স্পষ্টীকৃত হয়েছে। কিন্তু তার বৃত্তি রহস্যাবৃত। অন্তর্বেদি আর্য্যবর্ণঃ বহির্বেদি শৌদ্রঃ—জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে প্রাপ্ত এই বর্ণনায় আর্য ও শূদ্রের মাঝখানে সামাজিক দূরত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধা হয় না। [জৈ ব্রা ২।৪০৫]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে শূদ্র হচ্ছে অন্যস্য প্রেষ্যঃ বা অন্যের চাকর এবং যথাকামবধ্যঃ, অর্থাৎ, তাকে তার প্রভু ইচ্ছামতো মেরে ফেলতে বা আঘাত করতে পারেন। ঈদৃশ হীনতা-প্রাপ্ত শূদ্র তো গোলাম—প্রাচীন মিশরীয়,

সেমিটিক, গ্রীক ও রোমীয় গোলামদের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়াবার যোগ্য। [ঐ ব্রা ৭।৫।৩]

খুব সম্ভব অনার্য সংশ্রবের ফলে বৈদিক সমাজে গোলামীর বিকাশ হয়েছিল। অথর্ববেদীয় নজির দ্বারা গোলামী স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। অথর্বমন্ত্রে উল্লিখিত নাথ ও কিঙ্কর হচ্ছে যথাক্রমে গোলামের মালিক ও গোলাম। [অথর্ব ৮।৮।২২ ; ১৩।২।৩৭]

শূদ্রের গোলামীবৃত্তিকে আমরা সন্দেহ করতে পারি না, যদিও শূদ্রমাত্রই গোলামের কাজে নিযুক্ত হতো এরূপ অনুমান অসঙ্গত।

শূদ্রের দাস্য মনুসংহিতায় স্বীকৃত হয়েছে। [৮।৪১৩-৪১৫]

বৌধায়ন শূদ্রের উপর পরিচর্যা-বৃত্তি ন্যস্ত করেছেন। [বৌ ধ সূ ১।১০।১৮।৫]

তিনি বৈশ্যের অধ্যয়ন ও যজনে অধিকার স্বীকার করেছেন, কিন্তু শূদ্রের বেলায় এই অধিকারের কথা বলেন নি। আপস্তম্ব খোলাখুলিভাবে বলেছেন:

অশূদ্রাণাম্ উপায়নম্ বেদাধ্যয়নম্ অগ্ন্যাধেয়ম্ ফলবন্তি চ কর্মাণি।

অর্থাৎ, যারা শূদ্র নয় তাদের জন্যই বেদাধ্যয়ন, অগ্ন্যাধেয়-রূপ যজন কর্ম এবং ফলপ্রসূ কর্ম বিহিত। ফলপ্রসূ কর্ম যজন ছাড়া আর কিছু নয়। (আ ধ সূ ১।১।১।৬]

এই উক্তি থেকে ধরে নেওয়া যায় যে শূদ্রেরা বেদাধ্যয়নে ও যজনে অধিকারী ছিল না। যজন-কর্মে পুরোহিতের প্রবর (পূর্বপুরুষ-পরিচিতি) গ্রহণ করতে হতো। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বেলায় এই নিয়ম খাটত, কিন্তু যাদের যজন-কর্ম ছিল না তাদের ক্ষেত্রে পুরোহিতের প্রবর দ্বারা পরিচিতির আবশ্যকতাও ছিল না। সুতরাং বৈদিক আমলে শূদ্রের উপর গোত্রারোপের কোনো বিধি ছিল না এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি আমরা। [কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্র—৩।২।১১, কর্কের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতেও শূদ্রের গোত্র-পরিচয় ছিল না এবং তার কারণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা তাদের ধর্মীয় কর্মে অংশ গ্রহণ করতেন না। [p. 55, *The Hindu law of marriage and Stridhana*, 1896]

শূদ্রের অধিকার

বৈদিক আমলে শূদ্রেরা যজ্ঞীয় ধর্মে অধিকারী ছিল না এবং সেই কারণে পুরোহিতের গোত্র দ্বারা পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেত না এবিষয়ে মতানৈক্যের

অবকাশ নেই। অনেকে অবশ্য বলেন যে অথর্ববেদীয় ম্যাজিক-মিশ্রিত আচরণে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের অধিকার স্বীকৃত ছিল। ইদানীং শেণ্ডে মন্তব্য করেছেন যে অথর্ববেদীয় ধর্মে অংশ গ্রহণ করত আর্য ও শূদ্র, নারী ও পুরুষ, গ্রামবাসী ও নগরবাসী প্রকাশ্যে অথবা গোপনে এবং এক্ষেত্রে গণ্ডীবদ্ধতা-সূচক কড়াকড়ি ছিল না। [pp. 4-5, *The religion and philosophy of the Atharvaveda*, N. J. Shende, 1952]

দার্শনিক বিদ্যায় শূদ্রের অধিকারের প্রমাণও পাওয়া যায়। উপনিষদীয় উপাখ্যানে দেখছি জানশ্রুতি দাতারূপে পরিচিত, তিনি সর্বত্র আবসথ বা পান্থশালা নির্মাণ করেছেন, তাঁকে রৈক্ব শূদ্র-রূপে সম্বোধন করছেন, আবার বিদ্যাশিক্ষাও দিচ্ছেন। [ছা উ ৪।১।১ ; ৪।২।৪, ৫ ; pp. 4-5, *Social and religious life in the Grihya Sutras*, V. M. Apte, 1954]

এখানে আমরা শূদ্রের গোলামীর ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি। শূদ্রমাত্রই যে গোলামীবৃত্তির দ্বারা সমাজে পরিচিত হতো না একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু বৈদিক পর্বে শূদ্রের অনার্যত্ব স্বীকার করতে বাধা নেই।

আর্য ও অনার্যের মিশ্রণের ফলে শূদ্র-রূপে পরিচিত গোলামের আবির্ভাব হয়েছিল। আর্যসমাজে অনার্যের প্রবেশ ঘটত গোলামরূপে এবং গোলামকে শূদ্র আখ্যা দেওয়া হতো, আবার অনার্য গোষ্ঠীর যে কোনো লোককেই বলা হতো শূদ্র। প্রথম দিকে শূদ্রের যজনাধিকারের প্রশ্ন ওঠেনি, কিন্তু কালের পরিবর্তনে অনার্য-সঙ্গম বাড়তে থাকে, আর্যসমাজের পরিধিও প্রসারিত হতে থাকে, শূদ্রের যজন ও যাজন নিন্দিত হলেও স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়। শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ যে সময়ে নিন্দিত হয়েছেন, তখন অনার্যের আর্যীকরণ অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে এবং আর্য ও অনার্যের ভেদগণ্ডী রক্ষার চেষ্টাও চলছে। [বিষ্ণুস্মৃতি, ৮২।১৪]

শূদ্রপরিচিতির প্রসার

প্রাথমিক সামাজিক বিভাগে আর্য জনসাধারণ, অর্থাৎ, শাসকশ্রেণী বাদে [illegible] সমস্ত লোক কথিত হতো বিশ্-রূপে এবং শূদ্র ছিল আর্য গণ্ডীর বহির্ভূত। বিশ্ ও শূদ্রের এই ব্যবধান ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়েছে, যখন আর্য ও অনার্যের পারস্পরিক সংশ্রবের ফলে সামাজিক জটিলতা দেখা দিয়েছে। মনু ও কৌটিল্য শূদ্রের গোলামীর বিষয়ে ছিলেন সচেতন, কিন্তু কৌটিল্য আর্য-

প্রাণ শূদ্রের উদ্ভব লক্ষ্য করেছেন। অর্থশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে আর্যরক্ত গোলামীর প্রতিবন্ধক নয়। পাণিনি-সূত্রে জটিল সামাজিক পরিবেশের সংবাদ পাই আমরা। পাণিনি শূদ্রবর্ণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে অনিরবসিত, অর্থাৎ, সমাজ থেকে অবহিষ্কৃত এক শ্রেণীর শূদ্র ছিল। এরা বোধ হয় শিল্পজীবী। নিরবসিত বা সমাজ থেকে বহিষ্কৃত শূদ্রের কথা নিশ্চয়ই তিনি জানতেন। শেষোক্তের উদাহরণ-স্বরূপ ভট্টোজিদীক্ষিত চণ্ডালের নাম উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে শূদ্র-পরিচয়ের ক্রমিক ব্যাপ্তি স্ফুট হচ্ছে। [পা ২।৪।১০]

স্মার্ত বিবরণে বৈশ্য ও শূদ্রের বৃত্তিকে তফাৎ করা যায় না।

পরাশরের মতে শূদ্র, বৈশ্য, এমনকি ক্ষত্রিয়ও কৃষিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। [২।১৫]

যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন যে দ্বিজশুশ্রূষা ছাড়াও শিল্প ও বাণিজ্যে শূদ্রের অধিকার রয়েছে। [১।১২০]

বিষ্ণুও বলছেন,—শূদ্রস্য সর্বশিল্পানি। [২।৫]

এরূপ বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে শূদ্র-পরিচয়ে কোনো বিশেষ বৃত্তি বা অনার্যগোষ্ঠী বিচার্য নয়, ব্যাপক জনসাধারণ শূদ্র-নামের দ্বারা সংজ্ঞিত হচ্ছে। ঈদৃশ সামাজিক পরিস্থিতির পিছনে রয়েছে আর্য ও অনার্যের সংমিশ্রণের দীর্ঘায়ত ইতিকাহিনী।

যৌন সংমিশ্রণ

আর্য ও অনার্যের বিরোধ-চিত্রের পাশাপাশি মিলনালেখ্য ঋগ্বেদে প্রদত্ত না হলেও উভয়ের সামাজিক সংশ্রব ঋগ্বেদীয় আমলেই শুরু হয়েছে এবং এর ফলে যৌন সংমিশ্রণের সুযোগ সৃষ্ট হয়েছে। অনেকের মতে ভারতে আগমন-কাল থেকেই আর্যেরা অনার্য স্ত্রী গ্রহণ করতেন, যেহেতু তাঁদের সমাজে স্ত্রীলোকের অভাব ছিল। যদুনাথ সরকার এই মত প্রকাশ করেছেন। সি. ভি. বৈদ্য এমন কথাও বলেছেন যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাল্পতার জন্য আর্যসমাজে বহুপতি-বিবাহ ও নিয়োগপ্রথার প্রচলন হয়েছিল। [pp. 16-17, *India through the ages*, Jadunath Sarkar, 1928 ; p. 86, *Epic India* C. V. Vaidya, 1907]

প্রাচীন কাহিনীগুলিতে আর্য ও অনার্য নর-নারীর যৌন সংশ্রবের ইতিহাস

লুকিয়ে রয়েছে। যৌন মিলনের অর্থ প্রতিক্ষেত্রেই বিধিপূর্বক পাণিগ্রহণ নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়েছে অস্থায়ী সম্পর্কের আলেখ্য, কতকটা যেন মর্গান্-এঙ্গেল্স্-কথিত pairing family বা মিথুন-পরিবারের লক্ষণযুক্ত। একই ব্যক্তিকে বহুপতি বিবাহের কিংবা বহুস্ত্রী বিবাহের নিদর্শনে ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ ভীম ও অর্জুনের নাম উল্লেখ করতে পারি। এতে প্রতিপন্ন হয় যে একই সামাজিক পরিবেশে বহুপতি বিবাহ, বহুস্ত্রী বিবাহ এবং একবিবাহ বৈধতার সমর্থন পেতে পারে!

অনার্য কন্যা-বিবাহের ভিতর দিয়ে অনুলোম-বিধির উদ্ভব হয়েছে। এই বিধান অনুসারে অনার্য নারী আর্য গৃহস্থালীতে স্থান লাভ করত। অনুলোমের অনুমোদন সহজতর হলেও এর বিপরীত প্রতিলোমের সমর্থন সহজলভ্য ছিল না, কেননা প্রতিলোমের ক্ষেত্রে আর্য রমণীকে অনার্যের গৃহে প্রবেশ করতে হতো। রাক্ষস রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণের কাহিনী বিবাহের চিত্র নয়, সুতরাং প্রতিলোমের নিদর্শনরূপে বিচার্য হতে পারে না।

আমরা এস্থলে যৌনসংমিশ্রণের কয়েকটি কাহিনী উপস্থাপিত করছি।

(ক) মহাভারতীয় আখ্যান অনুসারে শান্তনু বিবাহ করেন দাশরাজ-কন্যাকে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ থেকে জানতে পারি যে দাশের জীবিকা হচ্ছে মৎস্য শিকার। ক্ষুদ্র জলাশয়ের সঙ্গে দাশের সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং দাশ মৎস্যজীবী হতে পারেন। দাশকন্যার কুমারী অবস্থায় মাছের মতো গন্ধ ছিল, এর তাৎপর্য হতে পারে তিনি জেলের মেয়ে। অনেকেই বলেন যে মাছ আর্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়। ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগুলিতে সমুদ্র, লবণ, মৎস, কাঁসা, পিতল, টিন, উষ্ট্র (Camel), সিংহের বাচক সজাতীয় শব্দ দৃষ্টিগোচর হয় না। মাছের সঙ্গে আদি-অস্ট্রেলীয় অষ্ট্রিকভাষীদের সম্বন্ধ যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে দাশকন্যার অনার্যত্বে কোনো সন্দেহ থাকে না।

মহাভারতের শান্তনু হচ্ছেন ঋগ্বেদের শংতনু। তিনি একজন আর্য নৃপতি। তাঁর অনার্য বধূ গ্রহণ সত্য হলে বলা চলতে পারে যে ঋগ্বেদীয় আমলেই আর্য ও অনার্যের যৌন সংমিশ্রণ শুরু হয়েছে। [মহা ১।১০০।৪৭, ৪৮, ৫০ ; ১।১০১ ; ১।১০৪।১২ ; ঋ ১০।৯৮।৭ ; তৈ ব্রা ৩।৪।১২ ; pp. 306-307, *Foundations of language*, Gray ; pp. 84-88, *The Aryans*, Gordon Childe]

(খ) দাশ-কন্যার কুমারী অবস্থায় পরাশরের সঙ্গে যৌন মিলন ঘটেছিল। পরাশর হচ্ছে একটি আর্য গোত্র-নাম। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে পরাশর

গোত্রের কোনো লোক অনার্য দাশ-কন্যার সহিত মিলিত হয়েছিলেন। এই মিলন-জাত কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের কৃষ্ণ-ত্বক্ অহেতুক নয়। [মহা ১।১০৪।১২ ; প্রবর প্রশ্ন ৮।৪৮]

(গ) মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে যযাতি রাজা অসুরদের পুরোহিত শুক্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। যযাতি নহুষের পুত্র, ঋক্ মন্ত্রে উল্লিখিত হয়েছেন।

জৈমিনীর ব্রাহ্মণ ও মৎস্য পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী উশনা কবির বংশধর, অর্থাৎ কাব্য। তিনি এবং শুক্র এক ব্যক্তি। কবি হচ্ছেন ভার্গব বা ভৃগুর বংশধর। এই ভৃগু একটি আর্য গণের নাম। আর্য ভৃগুর বংশে অসুর-রূপে পরিচিত উশনা বা শুক্র এলেন কি করে? ঈদৃশ অসঙ্গতি আরও অনেক রয়েছে। এর মূলে রয়েছে আর্যীকরণের দীর্ঘ ইতিবৃত্ত এবং সেই উদ্দেশ্যে পুরোহিতদের কৃত্রিম ঘটনা সংযোজন। আর্যীকরণের প্রয়োজনে বহুক্ষেত্রে উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে চেপেছে, প্রকৃত ইতিহাসে বিচিত্র রকমের সত্য ও মিথ্যার সমন্বয় ঘটেছে। [মহা ১।৮১।৩৬-৩৭ ; ঋ ১০।৬৩।১ ; কবি : ভার্গব :— জৈ ব্রা ১।১৬৬ ; ১।১২৫ ; মৎস্য ২৫।২৫]

(ঘ) আর্য ও অনার্য শঙ্করের নিদর্শন-রূপে গণ্য হতে পারে উলূপী, চিত্রাঙ্গদা ও হিড়িম্বার কাহিনী। উলূপী নাগ-কন্যা। নাগের অর্থ সাপ টটেম। টটেমের ব্যাপারটা অনার্য সমাজীয়—একথাই ইদানীং অনেকে বলছেন। পাণ্ডু কৌমের আর্যত্বে যদি সন্দেহ করা না হয়, তাহলে অনুমান করা চলে যে একটি আর্য কৌমের লোক হয়েও অর্জুন অনার্য উলূপীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। আর এক রমণীর সঙ্গেও তাঁর সাময়িকভাবে যৌন সম্বন্ধ হয়েছিল। তিনি চিত্রাঙ্গদা। তাঁর জন্মস্থান মণিপুর, অর্থাৎ, আর্য পরিধির বাইরে।

হিড়িম্বা তো রাক্ষসী। রাক্ষসী মানে অনার্য কৌমের ললনা। তাঁর সাহচর্যে ভীমের আর্যত্ব ক্ষুন্ন হয়নি। [মহা ১।২১৪।১৮,৩৩,৩৪ ; ১।২১৫।১৮-২৬ ; ১।১৫৫।১৯-৩১ ; pp. 32-34, *Studies in Indian antiquities*, H. C. Ray Chaudhuri, 1932]

গোত্র-তালিকায় অনার্য নাম

বৌধায়নের প্রবরপ্রশ্নে গোত্রের একটি তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। এর অন্তর্গত কোনো কোনো নামের আর্যত্ব বিশ্বাস করা কঠিন। দু-চারটি উদাহরণ এস্থলে গৃহীত হতে পারে।

গৌতম গোত্রের একটি শাখা হচ্ছে পৌঞ্জিষ্ঠি। তৈত্তিরীয় সংহিতায় নিষাদের সঙ্গে পুঞ্জিষ্ঠের একত্র উল্লেখ থেকে ধারণা হয় যে পুঞ্জিষ্ঠ একটি অনার্য কৌমের নাম।

আসুরায়ণ হচ্ছে কশ্যপগোত্রের শাখা। আসুরায়ণকে অনার্য গোষ্ঠী-রূপে বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত, কেননা অসুরের সঙ্গে আসুরায়ণ সংশ্লিষ্ট। অসুর ও অনার্যের অভিন্নতা প্রশ্নের বিষয় হতে পারে না।

তৃতীয় নমুনা হচ্ছে বালেয়—অত্রিগোত্রের একটি শাখা। বিষ্ণু পুরাণের বিবরণ অনুসারে বালেয়-রূপে গণ্য হয় কয়েকটি কৌম। যথা, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং পুণ্ড্র। এই কৌমগুলি বলিরাজার পত্নীতে দীর্ঘতমা-কর্তৃক উৎপন্ন হয়েছিল। এরা সকলেই নিষিদ্ধ দেশের অধিবাসী। বৌধায়ন বলেছেন যে :

(ক) অঙ্গ ও মগধ হচ্ছে সঙ্কীর্ণযোনি ;

(খ) পুণ্ড্র, বঙ্গ ও কলিঙ্গদের দেশে গমন করলে যজন দ্বারা শুদ্ধ হতে হয়।

ঈদৃশ বিবরণের মধ্যে আংশিকভাবে সত্য নিহিত রয়েছে। বৈদিক আর্যদের একটি নির্দিষ্ট গণ্ডী ছিল। এই গণ্ডীর বহির্ভূত আর্যেরা ব্রাত্য-রূপে বিবেচিত হয়েছেন পুরাতাত্ত্বিক-মহলে। রমাপ্রসাদ চন্দ ব্রাত্যের এরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে অবৈদিক আর্যেরাই শুধু ব্রাত্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাঁরা ছাড়াও অনার্য গোষ্ঠীও কখনও কখনও ব্রাত্য-রূপে কথিত হয়েছে। মনুর মতে খস ও দ্রাবিড় ব্রাত্য রাজন্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

আর্য ও অনার্যের সীমারেখা আমাদের নিকটে অপরিচিত। তাই এ বিষয়ে প্রকল্পই একমাত্র সম্বল। প্রকল্পের বাইরে কখনও আমরা যেতে পারি না। সহজ বুদ্ধিতে কল্পনা করা চলে যে যজ্ঞীয় চর্যা (cult) যাঁদের আচরণীয় ছিল না তাঁরাই ছিলেন ব্রাত্য। ব্রাত মানে দল বা গোষ্ঠী। ব্রাত্যেরা বিভিন্ন গোষ্ঠী-ভুক্ত ছিলেন, তাই ব্রাত্য-রূপে তাঁদের পরিচিতি। তাঁরা যজন-রহিত আর্য গোষ্ঠীও হতে পারেন, কিংবা অনার্যগোষ্ঠীও হতে পারেন।

'বালেয়' গোত্রের অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীগুলি বৈদিকদের পংক্তি-বহির্ভূত, সুতরাং ব্রাত্য। তাদের ভিতরে কে আর্য কে অনার্য তা নির্ণয় করা কঠিন।

গোত্র-তালিকায় এই নামের অন্তর্ভুক্তি নিরর্থক নয়। এর পিছনে রয়েছে

আর্যীকরণের কলাকৌশল। [প্রবরপ্রশ্ন ২।১৫ ; ৭।৪১ ; ৫।২৭ ; তৈ স ৪।৫।৪ ; বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৮।১ ; বৌধায়ন ধর্মসূত্র—১।১।২।১৪, ১৫ ; মনু ১০।২২]

ব্রাত্যস্তোম

বৈদিক আমলেই যে আর্যীকরণ শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রাত্য স্তোমের মধ্যে। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে ব্রাত্য স্তোমের নিদর্শন দৃষ্ট হয়।

ক্যালাণ্ডের মতে ব্রাত্য হচ্ছে Joined group বা দল-বদ্ধ জন-গোষ্ঠী। এরা ব্রহ্মচারী বা ছাত্রের কর্তব্য হিসেবে বেদপাঠ করে না, কৃষি ও বাণিজ্য বৃত্তি গ্রহণ করে না, উষ্ণীষ ও উপানহ্ (জুতা) পরিধান করে। ব্রাত্য স্তোম অনুষ্ঠানের দ্বারা এরা হীনদশা থেকে নিষ্কৃতি পায়। চারিটি ব্রাত্য স্তোমের সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেই। [প ব্রা ১৭।১-৪]

অথর্ববেদে একটি সমগ্র কাণ্ড ব্রাত্যের মহিমা-কীর্তনে নিয়োজিত হয়েছে। ব্রাত্য-রূপী প্রজাপতি ধনুক গ্রহণ করেছেন, তাই হচ্ছে ইন্দ্র ধনু। তাঁর পশ্চাতে আদিত্যগণ, সকল দেবগণ, দিতি, অদিতি, ইড়া, ইন্দ্রাণী ধাবিত হচ্ছেন। তাঁকে অনুসরণ করছে ইতিহাস, পুরাণ, গাথা ও নরাশংসী। এই ধরনের অতিশয়োক্তিতে উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয়েছে ব্রাত্যকে লক্ষ্য করে। বেশভূষার নামকরণে আসল ব্রাত্যকে আমরা চিনতে পারি। কিন্তু মনে হয় যে ব্রাত্য উপলক্ষ মাত্র, দার্শনিক রহস্যবাদ প্রকৃত আলোচ্য বিষয়। [অথর্ব ১৫।১।১,৬ ; ১৫।২।১-৬ ; ১৫।৬।১১,২০]

পণ্ডিতেরা বলেন যে ব্রাত্যেরা বেদ ও যজ্ঞকে স্বীকৃতি দিতেন না, সেই কারণে ছিলেন অপাংক্তেয় বৈদিক সমাজে, কিন্তু তাঁরা আর্য গোষ্ঠীগুলির একাংশ ছিলেন। এঁদের সঙ্গে তুলনীয় ঋগ্বেদে উল্লিখিত ব্রত-বিহীন মন্ত্র-বিদ্বেষী জন-গোষ্ঠী। ঋক্‌মন্ত্র-বর্ণিত ব্রহ্মদ্বিষ্ মন্ত্র উচ্চারণ করে না, অপ-ব্রত বা অব্রত মানুষেরা ব্রত পালন করে না। মন্ত্র-বিদ্বেষী যজ্ঞ-বিরোধীদের মধ্যে যজ্ঞীয় সংস্কৃতিকে প্রসারিত করবার জন্যই ব্রাত্য স্তোম উদ্ভাবিত হয়েছিল। অনার্যদের জন্য ব্রাত্য স্তোম বিহিত ছিল না এমন কথা বলা যায় না, যেহেতু এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ চোখে পড়ে না। [ঋ ১।১৩০।৮ ; ৫।৩৩।৩ ; ৫।৪২।৯ ; p. 13. *A Survey of Indian history*, K. M. Panikkar, 1954]

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

জতুগৃহ

বিজন ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কংশ-র অফিস। মস্ত বড় সেক্রেটারিয়েট। আপাত শান্ত নিঝুম পরিবেশ। ফাঁকা চেয়ার। নেপথ্যে ঝড়ের বেগে শুধু টাইপ করার শব্দ শোনা যাচ্ছে। নড়ে ওঠে ছায়াটা। দেখা যায়, খোলা জানালার কাছে গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পাইপ খাচ্ছে কংশ। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠতেই ঘুরে দাঁড়ায়। ত্রস্তে এসে টেলিফোনটা তুলে নেয়।

কংশ : Yes, hm' hm'. No---no. Yes. What is it? I see. I see. No. No....

[টেলিফোন রেখে দু-এক পা এগিয়ে ফিরে এসে টেলিফোন তুলে নেয়]

Ayer! Ayer, see me at once.

[টেলিফোন রেখে চেয়ারে গিয়ে বসে স্তূপীকৃত কাগজপত্রে সই করতে থাকে একটার পর একটা]

[সেক্রেটারি আয়ার-এর প্রবেশ]

...Yes, (চোখ তুলে আয়ার-কে দেখে) ও, কই তোমার মগনরাম মাড়োয়ারী তো এলো না এখনও ?

আয়ার : It is two o'clock. He should have come by now. কেয়া মালুম! তিন বাজেকে অন্দর আ যায়েগা সায়েদ। কিঁউ কি বারা বাজে ম্যায়নে উনকো ফোন কিয়াথা। উনহোনে কহা কী ইনকমট্যাক্স অফিসমে থোড়াসা কামকে ওয়াজেসে উনকা কুচ্ দের হোগা।

কংশ : তো ফির রুপেয়া কী বাত কুছ্ কহা তুমনে ?

আয়ার : খাস কুচ্ বাতায়া নেহি, লেকিন মুঝে ইয়ে মালুম হোতা হ্যায় কি কমসে কম দেড়লাখ রুপেয়া তো উনহোনে জরুর দেঙ্গে।

কংশ : আচ্ছা!

আয়ার : নেহি তো মেরে পাস দুসরি এক পার্টি হ্যায়, আপ বাতচিত করলিজিয়ে, ঔর ভাগা দিজিয়ে ইস মাড়োয়ারীকো।

কংশ : লেকিন, টাইম বহুৎ কমতি হ্যায় না! Speculation ক্যায়সে হোগা? Now listen Ayer, বহুৎ হুঁশিয়ারীসে কাম করনা হ্যায়। Mr. Hammerton may drop here any moment from Delhi. Ledger Account বিলকুল Up-to-date হোনা চাহিয়ে। Auditorকে পাস গয়েথে তুম আজ?

আয়ার : জী।

কংশ : তো কেয়া কহা।

আয়ার : কহা তো সব manage কর লেঙ্গে।

কংশ : How? Indian Trading Corporation কী account-কে বারেমে কেয়া হোগা? ইয়ে তো সব Ghast organisation হ্যায় না? ...

আয়ার : উ তো হ্যায়হি।

কংশ : হ্যায় তো কেয়া ইন্তেজাম করোগে?

আয়ার : Auditor-নে খাস তো কুচ বাতায়া নেহি; লেকিন···

কংশ : I say bribe him by any means.

আয়ার : ম্যঁয় দেখতা হুঁ।

কংশ : আভিতক্ দেখতা হুঁ? পহেলেসেহি কহা কি নেই তুমনে··· you can well understand my position.

আয়ার : You see sir I too have made my position no less precarious.

কংশ : So what! Want to back-out now? At this moment?

আয়ার : No Sir.

কংশ : Then!···

[কার্ড হাতে বেয়ারার প্রবেশ]

···কেয়া মাঙ্‌তা?

বেয়ারা : [কার্ড দেয়] এক শেঠ সাব।

[কার্ডখানা এগিয়ে দিতে গিয়ে ভয়ে ফেলে দেয় মাটিতে]

কংশ : উঠাও উল্লু কাঁহিকা!

[কার্ড তুলে দেয় বেয়ারা]

(আয়ারকে) Look.

আয়ার : মগনরাম।

কংশ : (বেয়ারাকে) শেঠজী কো সেলাম দো।

বেয়ারা : জী সাব।

[বেয়ারার প্রস্থান]

কংশ : So I finalise the deal.

আয়ার : Yes sir.

কংশ : You can go...

[আয়ার-এর প্রস্থান ও মগনরাম-এর প্রবেশ]

···Oh, Please come, please come, take your seat, please take your seat.

মগনরাম : আপকি তবিয়ৎ ঠিক হ্যায়?

কংশ : জী হাঁ, বিলকুল, বৈঠিয়ে।

মগনরাম : জেরা সে দের হো গয়ী।

কংশ : কৈ বাত নেহি।

মগনরাম : Income Tax office-মে কুচ কাম থা।

কংশ : ফয়সালা কুচ হুয়া?

মগনরাম : কেয়া ফয়সালা হোগা! মতলব হি নেহি। অফসার নে কহা কি কেস ওঠাবেগা। উঠাবেগা তো উঠাও কেস। রামজী ভরোসা। ···ইস্ জমানেমে বিজনেস উজনেস কুচ হোগা নেহি বাবুজী। বিজনেসম্যান নাচার হো যায় তো ক্যায়সে হো সকতা বিজনেস ইয়ে তো বাতাইয়ে!

কংশ : উ তো ঠিকই হ্যায়।

মগনরাম : রামজী ভরোসা। ···মগর বাবুজী মুঝে আপ সাফ্ সাফ্ কহে দিজিয়ে ম্যঁয় ইস transaction-কে বারেমে কেয়া কর সকতা হুঁ। সাফ্ সাফ্ বাতাইয়ে!

কংশ : আয়ার কো সাথ আপকি কুচ্ বাতচিত হুয়ী?

মগনরাম : আইয়ারকি বাত ছোড়িয়ে, আপ বাতাইয়ে।

কংশ : আপহি বাতাইয়ে।

মগনরাম : ম্যঁয় কেয়া বাতাউঁ···দেখিয়ে এক লাখ পচাশ হাজার তক্ ম্যঁয় দে সকতাহুঁ।

কংশ : For fifty tons of Rayon Silk ?

মগনরাম : লেকিন Forward Business কা হাল তো দেখিয়ে···। বাজার বহুৎ মন্দা হ্যায় বাবুজী।

কংশ : Rayon Silk কা লিয়ে নেহি শেঠজী। Import-কা মাল কৌন দেগা আপকো আজ, ইয়ে তো বাতাইয়ে? মেরী কোম্পানীকো India মে sole monopoly হ্যায় ইস Rayon Silk কা।

মগনরাম : উ তো ঠিক বাত হ্যায়।···তো আপহি বাতাইয়ে ম্যঁয় কুছ্ নেহি কহেঙ্গা, এক মালকা কারবার নেহি···

কংশ : Make the amount round two and I close the deal.

মগনরাম : মর জাউঙ্গা, মর জাউঙ্গা বাবুজী।

কংশ : আপকি মর্জি হো তো final কর লিজিয়ে শেঠজী, কেঁও কি দুসরী পার্টিয়োঁ ইস্কে লিয়ে ইন্তেজার কর রহি হেঁ।

মগনরাম : কৌন—নন্দলালা ?

কংশ : হ্যায় কোই।

মগনরাম : আচ্ছা !

কংশ : ঔর এক বাত ইয়ে হ্যায় কি if you agree to pay this sum you will have to close the deal to-day by five P.m., আজ পাঁচ বাজেকে অন্দর আপকো রুপেয়া দেনা পড়েগা।

মগনরাম : পাঁচ বাজেকা অন্দর ? হায় সিয়ারাম ! ইয়ে ক্যায়সে হো সকতা বাবুজী ? আপ কেয়া সমঝা Reserve Bank কী Currency মেরে ঘরমে বনতা হ্যায় ?

কংশ : তো ফির কেয়া শেঠজী !

মগনরাম : নেহি বাবুজী, উতনা তাগদ্ নেহি হ্যায় মগনরামকা। আপ দুসরি পার্টিকো দে দিজিয়ে। ···কেয়া বলুঁ রামজী ভরোসা

[মগনরাম-এর প্রস্থান]

[কংশ টেলিফোন তুলে নিয়ে আয়ার-কে রিং করে]

কংশ : Ayar, please see me.

[কাগজ ও ফাইলপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কংশ। একটু পরেই আয়ার প্রবেশ করে। ইতিমধ্যে টেলিফোনটা আবার জোরে বেজে ওঠে। আয়ার রিসিভার তুলে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময় ফুটে ওঠে তার চোখে মুখে]

আয়ার : Yes···(কংশ-কে) Trunk call from Bombay office sir.

কংশ : Must be Mr. Hammerton.

আয়ার : Just a moment please.

[কংশ-কে রিসিভার দেয়]

কংশ : Yes Mr. Hammerton, speaking—hm'·· hm'···hm'··· no, no, hm'—no, no sir—no further tenders and no further buying and selling of shares—sorry I mean, no no—by shares I meant···Mr. Hammerton—listen Mr. Hammerton—Hallo—Hallo···

আয়ার : By jove, you talked of shares। শেয়ার কি বাত আপনে কেঁও উঠায়া।

কংশ : Did I ! Mistake, A slip of tongue.

আয়ার : A slip !

কংশ : A slip. Give me the phone. (ফোন নেয়) Yes, Hallo Hallo·· Hallo···Hallo, no connection. (ফোন রেখে দেয়)

···But how could I talk of shares !

আয়ার : Just a slip.

কংশ : A slip and I go down. (পায়চারি করে) You can go Mr. Ayer.

আয়ার : Right sir.

[আয়ার-এর প্রস্থান]

[অ্যানির প্রবেশ]

কংশ : Any news Anne ?

অ্যানি : রঞ্জন আসবে, এখনি আসবে। আমি তাকে কিছু বলেছি। তুমি

তাকে বুঝিয়ে বলবে। He is simply mad after your sister.

কংশ : But that's a mad house. Father won't listen and that slip of a girl Kalyani, Oh, hopeless.

অ্যানি : Only a gesture from Kalyani earns you three to five lacks, honestly.

কংশ : আচ্ছা কল্যাণীর সঙ্গে তোমার এখন terms কেমন ?

অ্যানি : খুব ভালো।

কংশ : তুমি বললে সে শুনবে ?

অ্যানি : How do I know that. পার্টি দিলাম, দু-জনকে Dinner-এ নেমন্তন্ন করে খাওয়ালাম, কি হলো ?

কংশ : হুঁ।...(তাড়াতাড়ি গিয়ে ড্রয়ার টেনে চিঠি আর ফাইল পত্তরের কাগজ বার করে ছিঁড়তে আরম্ভ করে এবং পোড়াতে থাকে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয় ঘরখানা। আরাম কেদারায় শুয়ে অ্যানির চোখে ঘুম এসেছিল, হঠাৎ সে কাশতে আরম্ভ করে একটানা)

অ্যানি : [কাশতে কাশতে] What this smoke nuisance ? কি করছ তুমি ?

কংশ : উঁ, না। কতকগুলো document—পুড়িয়ে দিলাম। কি হলো তোমার ? অ্যানি !

অ্যানি : A glass of water please···

[কংশ টেবিলের ওপর থেকে জলের গ্লাস অ্যানিকে দেয়। জল খায় অ্যানি। রুমাল ভিজিয়ে চোখে মুখে কপালে দেয়]

···horrible. What did you say.

কংশ : When ?

অ্যানি : Was it a fire.

কংশ : It is all over.

অ্যানি : Help me. I must take some rest,

কংশ : Come. Give me your hand.

[অ্যানিকে নিয়ে ভেতরে দিয়ে এসে চেয়ারে বসে আবার কাগজ ছিঁড়তে থাকে]

[রঞ্জনের প্রবেশ]

...এসো এসো রঞ্জন এসো। আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে বসে আছি।

রঞ্জন : বৌদি আসেন নি ?

কংশ : এখনি আসবেন। তুমি বসো।

রঞ্জন : তোমার অফিস কি এখনও চালু নাকি দাদা ! clerks-রা এখনও কাজ করছে দেখলুম।

কংশ : না, অফিস formally বন্ধ ; তবে রাত্রেও কাজ হয়। অসম্ভব pressure তো !···Home life বলতে তো সব ধুয়ে মুছে গেছে।···এর চাইতে field work-ও ভালো। দশটা পাঁচটা খেটে খুটে বাড়ি ফিরে, উঁ···স্ত্রী অপেক্ষা করবেন সেজেগুজে, মান অভিমানের দু-চারটে কথাবার্তা হবে, most normal যা ব্যাপার—nothing is possible in my position. লাখ লাখ টাকার responsibility, businees expand করছে চতুর্গুণ অথচ ব্যাটারা মাছের তেলে মাছ ভাজতে চায়—ঘরকা মুরগী ডাল বরাবর। আরে তাহলে Incorporated in India কথাটি লিখিস কেন ? তুলে দে।

রঞ্জন : কোম্পানি তো আপনাদের দারুণ solvent দাদা !

কংশ : তবে আর বলছি কি ? India Limited হবার পর থেকে স্রেফ overdraft-এর ওপর কাজ চলছে, cash balance কানাকড়ি। খবর রাখো ? এদিকে পাউণ্ড স্টার্লিং-এর গ্যাঁড়াকল ধরে fifty percent-এর ওপর profit চলে যাচ্ছে বাইরে। National economy, national wealth—এসব হবে কোত্থেকে ?

রঞ্জন : ও সব বড় বড় ব্যাপার। ও নিয়ে আপনি কেন মাথা ঘামাচ্ছেন ? চাকরী করছেন চাকরী করে যান।

কংশ : তাই তো করছি ভাই। দিনে কুলিয়ে উঠতে পারছি নে বলে রাতেও কাজ করছি, দেখছই তো।

রঞ্জন : Director's Board-এ গেলেই পারতেন এবার। offer তো দিয়েছিল আপনাকে।

কংশ : ঢাল নেই তরোয়াল নেই, অমন নিধিরাম ডিরেক্টর হয়ে আমার লাভ? সেই তো মাইনে নিয়ে কাজ করতে হবে। Share-holder তো আর করবে না?

রঞ্জন : তা অবিশ্যি ঠিক।

কংশ : তো তবে?···By the by, হেসিয়ানের tender-টা তোমরা দিয়েছ ভাই কিন্তু তাতে করে তোমরা কিন্তু honest quotation quote করো নি। আমি অবিশ্যি তোমাদের quotation-ই accept করে নিচ্ছি কিন্তু আমার commission-টা কিন্তু এবার ভাই কত্তাকে বলে···

রঞ্জন : Leave that to us. আপনি কিছু বলবেন না তো!

কংশ : বলিনি তো! বলো, কিছু বলিছি?

রঞ্জন : না, আপনি কেন বলবেন? তাহলে আমরা আর কি করতে আছি।···By the by, আপনার Studebaker Van, সেই যে বলেছিলেন না, ছ-মাস আগেই বাবা সেই order-টা place করেছিলেন; য়্যাদ্দিনে সেটা এসেছে।

কংশ : এসে গেছে!

রঞ্জন : বাবা বলছিলেন—আপনি আবার ইতিমধ্যে আমি আপনাকে বলেছি বলে ফাঁস করে দেবেন না কথাটা। ওটা আগামী 14th September আপনার গ্যারাজে তুলে দেওয়া হবে।

কংশ : ও! But why 14th?

রঞ্জন : বাঃ!

কংশ : ও জন্মদিন! সত্যি অতবড় একজন লোক হয়েও যে আমাদের মতো চুনোপুঁটির জন্মদিনের কথাটা কি করে মনে রাখেন এ এক তাজ্জব ব্যাপার! সত্যিই!

রঞ্জন : পাটের বাজার কিন্তু দাদা এবার সাংঘাতিক মন্দা।

কংশ : হোক না। ঘাবড়াচ্ছ কেন? তোমার সঙ্গে আমার কথার কোনো খেলাপ হবে না। মাল আমার চাই-ই, মাল আমি নেবও। সুতরাং পাটের দর বাড়ল কি কমল, তোমাদের তো কিছু এসে যাচ্ছে না।

রঞ্জন : আপনি ভরসা দিলে অবিশ্যি নিশ্চয়ই এসে যাচ্ছে না।

কংশ : এখন কথা হচ্ছে ভরসা তো ভাই দিয়ে যাচ্ছি সবাইকে, এদিকে নিজে কোনোই বরাভয় পাচ্ছি না। কি মানুষ, কি ভগবান, কেউ-ই মুখ তুলে চাইছেন না। আচ্ছা আমরা একটু কফি খাব না? কোথায় গেলে গা? অ্যানি, অ্যানি, অ্যানি! তোমার বৌদির তবিয়তটা আজ খুব একটা ভালো নেই। তাই একটু rest-এ আছে ভেতরে।

রঞ্জন : কি, অসুস্থ নাকি?

কংশ : না, অসুস্থ ঠিক নয়; ···আসছে, এক্ষুনি আসবে।

[চেয়ারে গিয়ে বসে। কাগজপত্র দেখে। ড্রয়ার বন্ধ করে। রঞ্জন ইতিমধ্যে পকেট থেকে একখানা চেক বই বার করে চেক ছিঁড়ে কংশ-র হাতে দেয়]

রঞ্জন : [চেক দেয়] এই নিন দাদা।

কংশ : কি? এটা আমার কি? (দেখে) রঞ্জন!

রঞ্জন : সামান্য ব্যাপার! ওটা কিন্তু আপনার personal.

কংশ : ও। লাখ টাকা নিশ্চয়ই সামান্য বলব না। Need I thank you for this!

রঞ্জন : না, কোনো দরকার নেই! আপনি হয় তো জানেন না দাদা, Roy and Roy Company-র Director's Board-এ বাবা আমাকে এবার জোর করে ঢুকিয়ে নিয়েছেন।

কংশ : Really! I am really happy Ranjan. খুব ভালো কথা। After all we need stout hearts for stout projects. New blood must come in.

[কফি নিয়ে অ্যানির প্রবেশ]

···শুনেছ অ্যানি, রঞ্জন এবার রয় এণ্ড রয় কোম্পানির ডিরেক্টরস্ বোর্ডে গেছেন।

অ্যানি : Really, how we cherished it Kansha.

কংশ : Happy news, very happy news.

রঞ্জন : আপনারা তো খুশি হবেন জানি-ই। গত বছরই বাবা নিয়ে নেন। আমিই আপত্তি করেছিলাম। বড্ড ঝামেলা আর ঝক্কি।

কংশ : তা নিতে হবে ঝক্কি। তোমরাই তো ঝক্কি নেবে এখন। I am really happy Ranjan.

রঞ্জন : কৈ, কল্যাণীকে তো দেখছি না বৌদি। আসে নি হয়তো!

অ্যানি : কি জানি, আসবার তো কথা ছিল। আমি অপেক্ষা করে আছি তার জন্যে।

কংশ : একবার রিং করে গ্যাখো না।

অ্যানি : করেছিলাম, বাড়িতে নেই।

কংশ : Appointment fail করা কিন্তু ভারি অন্যায়। আমি এটা একদম পছন্দ করি না।

রঞ্জন : না না, appointment কিছু ছিল না।

কংশ : আচ্ছা, বৌদির সঙ্গে তো ছিল। She should have come by this time.

[বেয়ারার প্রবেশ]

বেয়ারা : রায় সাব আয়া হ্যায় হুজুর।

কংশ : রায় সাব?

বেয়ারা : জী হাঁ সাব, বড়া রায় সাব।

কংশ : সে কি, জলদি যাও, সেলাম দো—অ্যানি!

রঞ্জন : বাবা হঠাৎ!

[সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এমন সময় মিঃ রায় প্রবেশ করেন]

মহীতোষ : খবর বার্তা না দিয়েই এলাম।

কংশ : আসুন আসুন।

মহীতোষ : টেলিফোন-এ কথাটা না বলে আমি নিজেই এলাম। (রঞ্জনকে) তুমি কতক্ষণ!

রঞ্জন : এই কিছুক্ষণ হবে। একটু আড্ডা দিচ্ছিলাম।

মহীতোষ : তা দাও। চেক-টা দিয়ে দিয়েছ?…অ! কিন্তু ব্যাপার হয়েছে যে ইতিমধ্যে একটা emergency develop করেছে; চেকখানা…

কংশ : কিছু বলবেন আমায়।

মহীতোষ : হাঁ, মানে চেকখানা ভাই তুমি 15th-এর পর ব্যাঙ্কে produce করলে ভালো হয়। কেন না, for some reasons of clearence এই account temporarily operate করছে না। After 15th যে কোনো date, কি, অসুবিধে হবে?

কংশ : না, মানে ব্যাপার হয়েছে যে…

মহীতোষ : একটু manage করে নাও, একটু! তাই আমি ফোন না করে একেবারে নিজেই এলাম। (উঠে পড়েন) রঞ্জনকে এবার Director's Board-এ নিইছি, শুনেছ নিশ্চয়ই।

কংশ : সেই কথাই তো হচ্ছিল এতক্ষণ।

মহীতোষ : হাঁ নিয়ে নিলাম, আচ্ছাঃ! (অ্যানিকে) What about that dimple, Anne.

অ্যানি : Dimple you said!

মহীতোষ : Yes, dimple on your cheeks when you smiled.

অ্যানি : Oh Mr. Roy, now you will find only the depression.

মহীতোষ : Why, you have not grown older as all that.

অ্যানি : Yes, but too old to have that dimple Mr. Roy.

মহীতোষ : Is it so?…So it is—hm'—hm'—hm'—churio everybody, good night, good night.

[মহীতোষ ও রঞ্জন রায়ের প্রস্থান]

কংশ : Everything seems conspiring.

অ্যানি : What has happened?

কংশ : তুমি ঢোকবার একটু আগে, রঞ্জন আমাকে একলাখ টাকার একখানা চেক দিলেন। কিন্তু তারপরই মিঃ রায় এসে সেই চেকটা withhold করতে বলে গেলেন—ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেই ভালো লাগছে না।

অ্যানি : মগনরাম আগরওলা এসেছিল তোমার কাছে। তুমি তাকে কিছু বলেছিলে?

কংশ : কাজের কথা ছাড়া কি বলেছিলাম মগনরামকে! মনে নেই।

অ্যানি : মিঃ রায় হয়তো মগনরামের কাছ থেকে কোনো কথা জেনে থাকবেন।

কংশ : কিন্তু কি কথা বলতে পারি আমি মগনরামকে!

অ্যানি : সে তুমি জানো কি বলেছ তুমি তাকে।

কংশ : তবে কি বম্বে অফিস টেলিফোনে যোগাযোগ করল মিঃ রায়ের সঙ্গে। বুঝতে পারছি না। না কি মিঃ হ্যামারটন…

অ্যানি : Why lose nerve darling !

কংশ : Anything may happen now, any time.

অ্যানি : But nothing must upset you.

কংশ : I am failing Anne.

অ্যানি : No darling, no. Steady, please be steady...

[বাহুবন্ধনে বুকে জড়িয়ে ধরে আশ্বাস দেয় অ্যানি]

...My Lord, oh God.

পর্দা

দ্বিতীয় দৃশ্য

অমল গুপ্ত-র ড্রইংরুমে সান্ধ্য ঘরোয়া মজলিস বসেছে। কল্যাণী একখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে। লতা, সুহাস ও অসীম তন্ময় হয়ে সেই গান শুনছে। একটু পরেই গান শেষ করে উঠে আসে কল্যাণী।

কল্যাণী : কি, কাঠপুতলির মতো সব চুপচাপ বসে আছো! এত কষ্ট করে গান শোনালাম, একটু appreciate করো! লতা বৌদির নিশ্চয়ই ভালো লাগে নি।

লতা : এমন চমৎকার লাগছিল না, কি বলব!

অসীম : আচ্ছা কল্যাণী, তুমি যখন গান করো, তখন গানের কথাগুলোকে তুমি একান্তভাবেই বিশ্বাস করে গান করো, না ?

কল্যাণী : হ্যাঁ কথামাত্রিক গান, কথাগুলোকে অপ্রধান করলে কোনো গানই ভালো করে গাওয়া হয় না। গাওয়াও হয় না আর শুনতেও ভালো লাগে না।

সুহাস : কথা দিয়ে সুরের খেই মাপা, এ-এক রবীন্দ্রসঙ্গীতেই সম্ভব হয়েছে। দু-তিনটে করে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলে কি শুনলে আমার তো মনে হয় অসীম, এই যে আমরা রোজ পুজোপাঠ করি না, তারও দরকার হয় না। গার্হস্থ্য জীবনে পাঁচটা কাজের মাঝখানে জীবন-যন্ত্রের এই সরলীকরণ, আমার মনে হয় মানুষের কল্যাণে রবীন্দ্র-প্রতিভার এক শ্রেষ্ঠ অবদান। ফুল চন্দনের মতো ছিটিয়ে দাও, দেখবে মরা মানুষ তাজা হয়ে উঠবে। বড় ভালো লাগে আমার।

অসীম : অতি সত্যি কথা বলেছেন মা আপনি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমালোচকরাও ঠিক এই কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবার চেষ্টা করেন, শুধু পণ্ডিতি করেন বলে তা সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য হয় না।

লতা : আচ্ছা সেই গানটা কল্যাণী, সেই যে সেদিন গাইছিলে না, কি যেন মুখটা, আহা মনে পড়ছে না কথাগুলো...

কল্যাণী : কোনটার কথা বলছ ? পূর্ণ চাঁদের মায়ায় ?

লতা : উঁহু।

কল্যাণী : তবে ?

অসীম : প্রফেসর তো এখনও এলেন না কল্যাণী, আমি উঠি তবে।

কল্যাণী : এত তাড়া কিসের মশাই আপনার ?

সুহাস : এক্ষুণি এসে পড়বেন। সময় হয়ে গেছে। আর একটু না হয় বসো।

[রঞ্জনের প্রবেশ]

লতা : রঞ্জন! এসো এসো।

রঞ্জন : অমল আছে ?

লতা : এখনই, তার ফিরতে রাত দশটা।

রঞ্জন : অথচ আমাকে টেলিফোন করে বললে যে আজ সকাল সকাল বাড়ি ফিরব তুই অবিশ্যি আসিস, কথা আছে।

লতা : তাহলে নিশ্চয়ই ফিরবে। বসো না।...আলাপ করিয়ে দেই—(অসীমকে) রঞ্জন রায়, নাম শুনে থাকবেন নিশ্চয়ই।

অসীম : হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

লতা : বর্তমানে Mining Federation-এর একজন হর্তাকর্তা, Chamber of Commerce-এর একজন উদ্যোগী সভ্য...

রঞ্জন : আঃ!

লতা : কেন, অন্যায় কিছু বলেছি ?

রঞ্জন : না। তা ওঁর পরিচয়টা দাও।

অসীম : আজ্ঞে আমার নাম অসীম সেন।

রঞ্জন : নমস্কার। আপনিই তো Nuclear Physics-এর ওপর Research Scholarship নিয়ে বিলেত যাচ্ছেন ?

অসীম : আজ্ঞে।

রঞ্জন : বেশ। ও সব বড় বড় ব্যাপার কি যেন মশাই আমার মাথায় আসে না। কল্যাণীরা ভালো বুঝবেন।

কল্যাণী : আপনার মাথায় এলে তো য়্যাদ্দিনে আপনি ছুঁড়েই মারতেন।

রঞ্জন : কি ?

কল্যাণী : Atom Bomb.

রঞ্জন : ও! সত্যিই কি অসাধারণ মেধা তোমার কল্যাণী। ভুয়োদর্শনটা তোমার এমন সুন্দর হয়েছে, ভাবতেই পারি নি।

কল্যাণী : সেই জন্যে তো বলি আপনি বোকা। দেখেও বুঝতে পারেন না।

রঞ্জন : তাই দেখছি। তারপর বৌদি, খবর কি আর সব বলো।

অসীম : আমি তাহলে উঠি আজ কল্যাণী। মাস্টার মশাই-এর সঙ্গে আমি না হয় কাল Laboratory-তে দেখা করব।

কল্যাণী : আচ্ছা।

[রসময়ের প্রবেশ এবং সুহাস ও লতার প্রস্থান]

রসময় : আরে এই যে অসীম! অনেকক্ষণ বসে আছ নিশ্চয়ই! কি করব, Prof Soong এসে মাঝখানে দেরি করিয়ে দিলেন। বিদেশী লোক, অভ্যাগতজন, পণ্ডিতব্যক্তি, উঠি উঠি করে দু-ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। এসো এসো, আমরা বরং ওপরে যাই। তারপর রঞ্জন! (অসীমকে) রঞ্জনের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে অসীম ?

অসীম : আজ্ঞে হ্যাঁ!

রসময় : খুব enterprising ছেলে। ওর বাপ একজন ধনকুবের বললেও হয়—শ্রীযুত মহীতোষ রায়; নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। বর্তমানে Private Sector-এ যে কটা heavy industry গড়ার scheme হচ্ছে তার মূলে আছেন রায়মশাই। খুব করিতকর্মা লোক। তা বসো তোমরা, গল্পসল্প করো। এসো অসীম।

[মহীতোষের প্রস্থান]

অসীম : [কল্যাণীকে] বাঃ, তুমিও চলে যাচ্ছ, উনি একা রইলেন, বসে গল্পটল্প করো!

[অসীমের প্রস্থান]

রঞ্জন : কি হলো ? তুমি গেলে না ?

কল্যাণী : না বসি। আপনি একা বসে থাকবেন!

রঞ্জন : হুঁ, আচ্ছা কল্যাণী!

কল্যাণী : বলুন।

রঞ্জন : বললে তো তুমি আবার চটে যাবে।

কল্যাণী : তা হলে চটাবেন না।

রঞ্জন : হয়তো এ বাড়িতে আর আমার আসা ঠিক নয়, কি বলো ?

কল্যাণী : সেটা আপনিই বুঝবেন ভালো। তবে কেনই বা আসবেন না। বন্ধুর বাড়ি।

রঞ্জন : কে বন্ধু!

কল্যাণী : কেন, আমার ছোড়দা, বড়দা, সবাই তো আপনার বন্ধু। বন্ধু আর তা ছাড়া business relation রয়েছে আপনার তাদের সঙ্গে।

রঞ্জন : হ্যাঁ, তবে business relation রাখার জন্যে রঞ্জন রায়কে কারো বাড়ি যেতে হয় না। এখানে আসি, তোমাকে ভালোবাসি বলে। বিশ্বাস করো কল্যাণী। তুমি ভাবছ···

কল্যাণী : আমি কিছুই ভাবছি না রঞ্জনবাবু। আমি শুধু দায়ে পড়ে বসে আছি। ছোড়দা কি লতা বৌদি যে কেউ আসলেই আমি উঠে যাব।

রঞ্জন : কেন কল্যাণী!

কল্যাণী : ঐ সব কথাই যদি আপনার আলোচনার বিষয়বস্তু হয় তো তার জবাব আমি আপনাকে অনেকদিন আগেই দিয়ে দিয়েছি।

রঞ্জন : আমিই শুধু বেহায়ার মতো সেই পুরনো কথার অবতারণা করছি, এই তো!

কল্যাণী : হ্যাঁ। আমি উঠলাম।

রঞ্জন : আচ্ছা বসো, আমরা আবহাওয়া নিয়ে কথাবার্তা কই; কেমন ? কল্যাণী!

কল্যাণী : না।

[কল্যাণীর প্রস্থান]

[রঞ্জন রায় ধপ করে সোফায় বসে পড়ে সিগারেট ধরায়]

[কংশ-এর প্রবেশ]

কংশ : কে রঞ্জন।…এই রঞ্জন, তোমরা আমার টাকাটা ভাই কিন্তু আজও দিলে না। দিয়ে দিও, জানো! বড্ড অসুবিধেয় আছি। এই জাগতিক অসুবিধে আর কি। মেমসাহেব বৌদি, বুঝতেই পারছ। সিগারেট আছে? (সিগারেট নেয়) আরে বাবা বড় জোর না হয় দু-দশ বছর জেলই হবে। ফাঁসি তো আর দিতে পারবি না!

রঞ্জন : আপনি বসুন।

[কংশ ধপ করে বসে পড়ে। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ে। রঞ্জন ইত্যবসরে উঠে ঘর থেকে চলে যায়। রঞ্জনের জায়গায় বীরু এসে বসে চুপ করে। কংশ একঝুল ঘুমের পর চোখ চেয়ে দেখে—রঞ্জন নেই। তার জায়গায় বীরু বসে আছে। দেখছে সে তাকে।]

কংশ : রঞ্জন। (বীরুকে) তুমি আবার কোত্থেকে।

বীরেশ : বাবা কোথায় বড়দা?

কংশ : বাবা, বাবা বাবার ঘরে।

বীরেশ : আচ্ছা একটু বসেই যাই।…তারপর বড়দা!

কংশ : কি বড়দা!

বীরেশ : এই খবর-টবর!

কংশ : চলছে।

বীরেশ : না, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

কংশ : তারপর, তোমার construction কেমন চলছে?

বীরেশ : খুব জোর, দিনরাত কাজ চলছে। নদীর জল ধাঁক ধাঁক করে বাড়তে শুরু করেছে তো! এখন সব তড়িঘড়ি ব্যাপার।…মেরে ফাঁক করে দিচ্ছে contractor.

কংশ : তুমি কি করছ?

বীরেশ : আমি আবার কি করব। চাকরি করছি।…যাগগে, ওসব কথা ছাড়ো। তোমার মামলার খবর কি তাই বলো।

কংশ : চলছে মামলা।

বীরেশ : Barrister হাজরা কি বলে?

কংশ : কি আর বলবে। হাজার এক টাকা করে daily শুনোগার দিচ্ছি।

: Justice সেন-এর সঙ্গে দেখা করেছিলেন বাবা?

: সম্ভবত।

: ভেঙে পড়ো না, ভেঙে পড়ো না।

: শালা Indian Constitution-ই ultravires করে দিলে! কপাল কপাল! পড়তো সেন-এর এজলাসে!

: ও সব সমান, সব।…ছাখো কি হয় শেষ পর্যন্ত।

: আমি ছাড়ব না। আমি ছাড়ছি না। দরকার হলে U. N. O. পর্যন্ত যাব।

: ঐ সব ছাড়ো, হুঁ! U. N. O. যাচ্ছেন!

: তুমি দেখে নিও। Anne! Anne!

: মনগড়া বিশ্বাস নিয়ে বেড়ে আছ সব।

[হাস-এর প্রবেশ]

…এই যে মা, এসো, বসো।

: অ্যানি কোথায় মা! অ্যানি!…

[কংশ-র প্রস্থান]

: মা তো বুঝলাম; কতক্ষণ এইছিস?

: এই কিছুক্ষণ।

: তা কি ভুলিও ইতিমধ্যে একবার বাড়ি আসতে পারো নি!

: কি করে আসব! চব্বিশঘণ্টা দিনরাত কাজ চলছে ড্যামে। দাঁড়াও, আগে প্লাবন সামলাই।

: এদিকে কংশ-র ব্যাপার নিশ্চয়ই শুনিছিস?

: কিছু কিছু।

: এখন কি হবে বল তো!

: দু-দিন বাদে জজ-এর মুখেই শুনতে পাবে।

: কংশ তো বলছে এমন তেমন হলে ও সুপ্রীম কোর্ট অবধি যাবে।

: শুধু সুপ্রীম কোর্ট, U. N. O. পর্যন্ত বলছিল। পাগল না মাথা খারাপ!

: তা এখন মাথা খারাপের মতোই হয়েছে!

: বোকার মতো ডান হাত বাঁ হাত করতে গিছলেন কেন? একশ বাটটা কম্পানি খুলে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যবসা করছে তারা, উনি গেছেন তাদের ওপর টেক্কা দিতে।

[কার্তিক

সুহাস : কেন, আমাদের সাঁটুল মিত্তির কি করল ? নাবালক দুই ছেলের নামে কোম্পানি খুলে চার কোটি টাকা গায়েব করে দিলে। কেউ তার টিকির নাগাল ধরতে পারলে ! ও বোকা, তাই…

বীরেশ : বোকা হলেই ঠোকা খেতে হবে। এই তো, সামনের ওপর পুকুর চুরি হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি…[কথার মাঝখানে ফোন বেজে ওঠে। বীরেশ ফোন ধরে) হ্যালো, কে ?—কাকে চাই ?—হ্যাঁ আমি বীরেশ গুপ্ত কথা কইছি।…

সুহাস : তা কি রাত্তির বেলা খেয়ে যাবি তো ?

বীরেশ : …আপনি কে কথা বলছেন ? হ্যালো, কি হয়েছে কি ? হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ ! তা ওখানে য়্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার কেউ নেই ? কি আশ্চর্য, আমি…। না ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে সবে তো ঘণ্টাখানেক বাড়ি ফিরেছি। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি spot-এ—contractor আছেন ?—গাঙ্গুলি সাহেব ?—কেউ না ?—আমি এক্ষুনি রওনা হয়ে যাচ্ছি—(ফোন রেখে দেয়) যা ভেবেছি !

সুহাস : আবার তোর কি হলো ?

বীরেশ : সাত মাসের কাজ সাত দিনে সারবে, Concrete set in করতেই দিলে না। এবার নির্ঘাত মরিছি।

সুহাস : তা সে বুঝবে এখন কন্ট্রাকটর ; তার দায়িত্ব।

বীরেশ : Explanation তো আর সে দেবে না। ধরতে চেপে আমাকেই ধরবে। Supervising Engineer ! কয়লা করে ছেড়ে দিলে জান ! আমি চল্লাম।

[কংশ-র প্রবেশ]

কংশ : বীরু হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল ! কি হয়েছে মা ?

সুহাস : গোদের ওপর বিষফোঁড়া, ওদিকে বীরুর construction site-এ কি যেন গণ্ডগোল হয়েছে।

কংশ : এখন থেকে 15th অবধি রাহুর দশা যাবে মা। প্রত্যেকেরই একটু করে খারাপ যাবে।

সুহাস : তোর এখন এই সব হচ্ছে। পুরুষকার ধুয়ে মুছে গেল, এখন হয়েছে অদৃষ্টবাদ। কি যে করছিস তোরা সব !

কংশ : আমরা আবার কি করলুম মা

১৩৮০]

[রসময়-এর প্রবেশ]

রসময় : না, সবই তিনি করাচ্ছেন। কি ব্যাপার কি ? চেঁচামিচি কিসের ?

সুহাস : ওগো বীরুর camp-এ না জানি আবার কি গণ্ডগোল হয়েছে।

রসময় : Camp-এ ?

সুহাস : না না Camp-এ কেন হতে যাবে, Dam-এ, Dam-এ।

রসময় : তাই বলো, বাঁধ-এ। কি হয়েছে কি বাঁধে ?

সুহাস : কি যেন হড়বড় করে কি সব কথা বল্লে ভালো করে বুঝতেও পারলাম না—কথা বলতে না বলতে এক ফোন—জিজ্ঞাসা করলুম রাত্রে খেয়ে যাবি তো ? তা কোথায় খাওয়া কার খাওয়া…

[ফোন বেজে ওঠে]

রসময় : [ফোন তুলে] হ্যালো…হ্যালো……

[নেপথ্যে জলোচ্ছ্বাস-এর শব্দ ক্রমবর্ধমান হয়ে ওঠে]

পর্দা

তৃতীয় দৃশ্য

বাঁধ-এর পাঁচ নম্বর গুমটি ঘর। ভেতরটা ভীষণ আর্দ্র, জলাজলা, পিচ্ছিল। লণ্ঠন ও টর্চ নিয়ে লোকজন ছুটোছুটি করছে। জলোচ্ছ্বাসের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কোথাও হাতুড়ি পেটার যান্ত্রিক ধাতব শব্দ শোনা যাচ্ছে। লোকজনের ত্রস্ত আনাগোনার সঙ্গে উচ্চৈস্বর হাঁকডাকও কানে আসছে। মিস্ত্রীরা কাজ করছে দৌড়ঝাঁপ করে। লোহার একটা মই-এ পা দিয়ে ঝুলে দাঁড়িয়ে একজন মিস্ত্রী সিলিং-এ কাজ করছে ছেনি হাতুড়ি দিয়ে দেখা যায়। জলের শব্দ, মিস্ত্রীর হাঁকডাক, লোহা বেড়ি হাতুড়ির শব্দে মুখর পরিবেশ।

শ্রমিক ১নং : ইসমাইল।

… : হাঁ।

… : যুগল কি করছ—চার নম্বর গুমটিতে যাও।

… : যুগল।

[সাব ইঞ্জিনিয়ারের দ্রুত প্রবেশ]

… : কি মশাই সব আপনাদের কাণ্ডবাণ্ড ! বীরেশবাবু কোথায়

গেলেন! Unprecedented ব্যাপার সব! Crack করে গেল!

সাব ইঞ্জিনিয়ার : সুপারভাইজিং ইঞ্জিনিয়ার আসছেন। Highest high water level exceed করে গেছে স্যার দেখলাম।

কণ্ট্রাকটর : আরে স্যার মশাই, তাতে কখনও Dam crack করে? আপনি আমায় শেখাচ্ছেন? Safety factor নেই?

সাব ইঞ্জিনিয়ার : Concrete set in করবার সময়ই তো পেল না স্যার। Construction-এর মাত্র তিন হপ্তার ভেতরেই জল highest water level reach করে গেল; আমি তাই বলছিলাম···

কণ্ট্রাকটর : তার জন্যে flood দায়ী। আমি নই।

সাব ইঞ্জিনিয়ার : ছি ছি, আপনাকে কে বলছে?

কণ্ট্রাকটর : হাঁ, কই এখনও তো এলেন না বীরেশবাবু।

[ওপর থেকে কর্মনিরত মিস্ত্রী লোহার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামে]

মিস্ত্রী : Spillway Bay-র একটা top দু-ফুট wash out হয়ে গেছে।

কণ্ট্রাকটর : য়্যাঁ, কি বলে কি! তুমি ঠিক বলছ? নাঃ!

[দ্রুত প্রস্থান]

২নং ইঞ্জিনিয়ার : Factor of safety দেখাচ্ছেন! (মিস্ত্রীকে) Soil testing defective ছিল, যার জন্যে foundation হয়তো fail করছে। তা, বলা যাবে এ কথা! Safety factor-এর পেছনে তোমরাই তো বংশদণ্ড দিয়ে বসে আছ।

মিস্ত্রী : Unadaltrated গঙ্গামাটি মশাই—কে test করেছে cement? বলতে গেলে অনেক কথা উঠে পড়বে। ... চাকরী খোয়াব? ও cement-এর character certificate যিনি দিয়েছেন, তিনি থেকে এখানকার top Boss অবধি; সবাই সমান। জাল গুটোলে দেখবেন সব বড় বড় রুই কাতলা উঠে আসবে। চেপে যান না।

২নং ইঞ্জিনিয়ার : চাপতে চাপতে তো চাপা পড়বার অবস্থা হলো। কি সাংঘাতিক কাণ্ডবাণ্ড ভাবতে পারেন?

মিস্ত্রী : লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন।

২নং ইঞ্জিনিয়ার : গৌরীসেন আর দেবে কোত্থেকে।

মিস্ত্রী : কেন, আবার টেক্স বসবে। দু-টাকা সের বেগুন কিনব আমরা—ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

২নং ইঞ্জিনিয়ার : ঐ বোধহয় সুপারভাইজিং ইঞ্জিনিয়ার আসছেন। নিন, একটু ঘোরাঘুরি করুন—কাজ দেখান, কাজ দেখান।

[ইঞ্জিনিয়ার ও কণ্ট্রাকটর পরিবৃত বীরেশ গুপ্ত-র দ্রুত প্রবেশ]

বীরেশ : কি হয়েছে কি, দেখি। এই বাত্তি মারো। আলো কোথায়?···

[শ্রমিকরা আলো হাতে ছুটোছুটি করে। দেখা যায় সূচাগ্র ছিদ্র পথ দিয়ে তীরের মতো জল ভেতরে ঢুকছে বিভিন্ন source থেকে]

···গ্যালারির ভেতরকার জল immediately pump out করবার ব্যবস্থা করো। Generator সরিয়েছ?

সাব ইঞ্জিনিয়ার : এক্ষুনি হয়ে যাবে স্যার।

বীরেশ : হয়ে যাবে, আর কখন হবে? এতক্ষণ তোমরা কি করছিলে? সেন কোথায়, সেন?—যাও, চটপট করো, চটপট করো। Pump house থেকে pumpগুলো সব সরাও। দেরি হলে আর সব পাবে না। ইসমাইল, কাত্তিক-কে ডাকো, কাত্তিক!

[জনৈক মিস্ত্রীর দ্রুত প্রবেশ]

২য় মিস্ত্রী : Under sluice ছ-নম্বর opening collapse করছে স্যার।

বীরেশ : কি বলছ কি?

২য় মিস্ত্রী : হাঁ স্যার।

বীরেশ : কি স্যার?

২য় মিস্ত্রী : ছ-নম্বর opening sir.

[কথাবার্তার মাঝখানে তীর্যক গতিতে জল বিভিন্ন ছিদ্রপথ দিয়ে তীরের মতো ঢুকে বীরেশ কণ্ট্রাকটর, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির গায়ে ও ভেতরকার দেওয়ালে লেগে রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ধূমায়িত হয়ে ওঠে]

কণ্ট্রাকটর : তাহলে!

বীরেশ : তাহলে আপনি তো আমার contract renew করবেন। আমার চাকরীটা খেলেন তো?

কণ্ট্রাকটর : বিশ্বাস রাখলে আবার চাকরী পাবেন। গভর্নমেন্ট তো আর কন্বিক হাতে করে Dam Construction করতে আসবে না। বাঁধ বাঁধতে হলে আবার আমাদেরই ডাক হতে হবে ; কি বলেন ?

বীরেশ : তখন একটু দেখবেন Sir.

কণ্ট্রাকটর : দেখব বৈ কি, নিশ্চয়ই দেখব। আপনি আমাকে দেখবেন, আমি আপনাকে দেখব, পারস্পরিক সাহায্য ছাড়া কখনও কাজ-কারবার চলে ?

বীরেশ : আপনি মাইরি বিশ্বকর্মা !

কণ্ট্রাকটর : তবে, গড়ো আর ভাঙো, ভাঙো আর গড়ো, এই তো লীলাখেলা, নাকি ? হা-হা-হা-হা··· !

[কণ্ট্রাকটরের অট্টহাসির কলরোলে আর দুরন্ত জলকল্লোলের শব্দে হট্টগোলের মাঝে ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে]

মন্থর পর্দা

চতুর্থ দৃশ্য

অমল গুপ্ত-র ড্রইং রুম। ফোন বেজে চলেছে। সামনেই বসে আছে অমল গুপ্ত, বসে আছে, অথচ ফোন ধরছে না। বেয়ারা ঢোকে। বাবুকে দেখে বেরিয়ে চলে যায়। ফোন বেজে বেজে থেমে যায় সাময়িকভাবে।

[অমল গুপ্ত-র প্রস্থান]

(আবার ফোন বাজতে থাকে)

[কল্যাণীর প্রবেশ]

কল্যাণী : হ্যালো, কে। অসীম !···তাই নাকি ? কি জানি কেন attend করা হচ্ছিল না ফোন।···হবে। এ বাড়ির এখন অনেক কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে না। মেজদার ব্যাপার শুনেছ ?···আমার আর এক মুহূর্ত ভালো লাগছে না এদের সংসর্গ। তুমি আসছ আজ ? আমি কিন্তু তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব। আচ্ছা, আচ্ছা ! (রিসিভার রেখে দেয়)।

[লতার প্রবেশ]

লতা : কার ফোন কল্যাণী ?

কল্যাণী : আমার।

লতা : রঞ্জন ফোন করছিল বুঝি !···

[কল্যাণী উত্তর দেয় না]

···যাগগে, আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার ছোড়দাকে যদি কেউ ফোন করে তো বলে দিও উনি কলকাতায় নেই। আর কিছু বলবার দরকার নেই।

কল্যাণী : আমি তোমায় ডেকে দেবো, তা হলেই হবে।

লতা : তাই দিও। তারপর ?

কল্যাণী : কি তারপর ? হাসছ যে মুখ টিপে ?

লতা : প্রাণ খুলে হাসবার আর সুযোগ দিলে কোথায় বলো। সবটুকু আনন্দই তো একান্তভাবে গোপনীয় করে রেখেছ দিদি। তবু যেটুকু হাসি, একান্তই অনুমানে, অনুভবে ; বলতে পারো খানিকটা বোকার মতোই !

কল্যাণী : তাই বুঝি !

লতা : তা নয় তো কি ! এক এক সময় এত কষ্টই হয় কল্যাণী; তুমি বুঝতে পারবে না।

কল্যাণী : সত্যিই ! আচ্ছা বৌদি আমার জন্যেই কি তোমরা সবাই নাচার হয়ে পড়লে সংসারে ?

লতা : মানে ?

কল্যাণী : অ্যানি বৌদিও সেদিন এই ধরনের কথাই বলছিল।

লতা : কি বলছিল ?

কল্যাণী : বলছিল, তুমি যদি তোমার দাদার ইচ্ছেটিচ্ছেগুলো খানিকটা অন্তত accomodate করতে তো মহীতোষ রায় would not have withdrawn his mind from Kangsha. আত্মমর্যাদা সম্পন্ন একজন ভদ্রঘরের বউ যে কি করে এই কথাগুলো বলে আমি ভাবতে পারি না।

লতা : এতে করে অ্যানির আমি বলব কোনো দোষ নেই। তোমার দাদা তাকে যা বুঝিয়েছেন অ্যানি তাই বলেছে। নিজের স্বার্থের দিকে চেয়ে কথা বলবার মতো মেয়ে সে নয়।

কল্যাণী : এ বাড়িতে নিজের স্বার্থের দিকে চেয়ে আবার কে কখন কথা বলে! অবাক করলে তুমি লতা বৌদি!

লতা : জানি তুমি কথা বলতে পারো কল্যাণী।…কথা যখন উঠল তা হলে বলেই ফেলি, আমাকেই বা তুমি স্যান্দিন ধরে কি বুঝিয়ে দিয়েছিলে কল্যাণী? আমি কি·অ্যানির কথা না হয় বাদই দাও, তোমার বাবা মা বড়দা মেজদা ছোড়দা—এঁরাও কি সবাই বরাবর বানিয়ে বানিয়ে তোমার নামে মিথ্যে কথা বলে এসেছেন? রঞ্জনের সঙ্গে তুমি যথেষ্ট প্রশ্রয় নিয়ে মেলামেশা না করলে কখনই তাঁরা…

কল্যাণী : বৌদি! সমস্বার্থের কাঁটা স্বামীদেবতাদের খাতিরে এখন তোমাদের মনেও খচ খচ করে বিঁধছে; জানতে আর কিছু বাকি নেই আমার।

লতা : তুমি মুখ সামলে কথা বলবে কল্যাণী।

কল্যাণী : মা তো ছেলেদের সম্পর্কে বরাবরই স্নেহান্ধ। তাঁর কথা আর তোমাদের কথা এক হলো?

লতা : আমি বলছিলাম…

কল্যাণী : না তুমি বলবে না। কোনো কথা বলবে না। আমি তোমার কোনো কথা শুনতে বাধ্য নই।

লতা : এই তো!

কল্যাণী : হঁ্যা।

লতা : বেশ, কিন্তু একটা কথা আজ আমি তোমায় স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই কল্যাণী…

কল্যাণী : তোমার গোটাটাই অস্পষ্ট। স্পষ্ট করে তুমি কি বলবে?

লতা : স্ববচনী বলে তোমার খ্যাতি আমার জানা আছে কল্যাণী! ঠিক আছে। আর প্রয়োজন হবে না কোনোদিন তোমার সঙ্গে আমার কথা বলবার। ছিঃ!

[লতার প্রস্থান ও সুহাস-এর প্রবেশ

সুহাস : কিরে কল্যাণী! ছোট বৌমার সঙ্গে আবার কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হলো। ছি, অমন করে ঘা দিয়ে কখনও কথা বলতে আছে? একেই বেয়াইমশাই-এর অবস্থা খারাপ; বাপের জন্যে

মন খারাপ হয়ে আছে ছোট বৌমার। হাজার হলেও—ও মা, তুই কাঁদছিস! কল্যাণী!

কল্যাণী : না মা।

সুহাস : আবার না কি! নাঃ, আমার হয়েছে…

[রসময়-এর প্রবেশ ও কল্যাণীর প্রস্থান]

রসময় : তোমার আবার কি হলো?

সুহাস : না, আমার আবার কি হবে!

রসময় : আহা, প্রত্যেকেরই যদি কিছু হয় তাহলে আর কি করে চলে? কিছু লোক থাকবে, যাদের কিছুই হবে না। নইলে শুনবে কে, দেখবে কে? তোমারও কিছু হয়ে কাজ নেই, আমারও কিছু হয়ে দরকার নেই।…

সুহাস : ছোট বৌমার সঙ্গে কি নিয়ে যেন আবার কথা কাটাকাটি হয়েছে মেয়ের।

রসময় : হ্যাঁ ও যেমন বাইরে তেমনি ভেতরে; নার্ভ কারোই ঠিক থাকছে না। নেহাৎ মানুষ, এতদিনকার অভ্যেস, তাই চক্ষুলজ্জার খাতিরে এখনও একজন আর একজনকে দাঁতে কামড়াচ্ছে না। কি আর বলব!…সবটাই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। চিৎ করা হিসেবের কড়ি সব মুখ থুবড়ে পড়ছে চোখের সামনে। কলেজে, ইস্কুলে, খেলার মাঠে, হাটে বাজারে, ঘরে—সর্বত্র সমান অবস্থা।…বেয়াইমশাই শুনলুম তো আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিকেলের দিকে সময় পাও তো একবার দেখে এসো।…অমলের ফেরবার কোনো সংবাদ পেলে?

সুহাস : হ্যাঁ, বৌমার কাছে শুনলুম কাল আসছে। অফিসে ট্রাঙ্ক করেছিল।

রসময় : আর এই Night plane-এ চলাফেরা করা!

সুহাস : sky master-এ কোনো ভয় নেই।

রসময় : হ্যাঁ কোম্পানি বলেছে! speed, খালি speed, কেবল speed, আরও speed.

পর্দা

পঞ্চম দৃশ্য

অমল গুপ্ত-র ড্রইং রুম সকাল বেলা। অমল গুপ্ত বম্বে থেকে ফিরছে, তাই তার সম্বর্ধনার খাতিরে সকাল থেকেই বন্ধুবান্ধব, বিভিন্ন জাতের পদস্থ ব্যবসায়ী, তথাকথিত সংস্কৃতিবিদ, শিল্পী, সাংবাদিক ও সস্তা সিনেমা পত্রিকার ফোটোগ্রাফার—সবাই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। এমন সময় অমল গুপ্ত একটি প্যান-আমেরিকান কোম্পানির কিটব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে ছায়াচিত্রের হিরোর মতো ড্রইং রুমে প্রবেশ করে। সঙ্গে তার বোম্বাই-এর এক ছায়াচিত্রের অভিনেত্রী—নাম রূপকুমারী। সম্বর্ধনার আতিশয্যে গুজরাটি, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী ও বাঙালি বন্ধুবান্ধব সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় অমল গুপ্ত-র দিকে।

অমল : হ্যালো হ্যালো হ্যালো হ্যালো !

রতিলালজী : স্থ ছে অমলবাবু !

অমল : জী হাঁ। ···তারপর সুখনলাল ?

সুখনলাল : আচ্ছা জী। আপনা তবিয়ত বিলকুল আচ্ছা হ্যায় ?

অমল : বিলকুল।

জনৈক পাঞ্জাবী বন্ধু : How do you do.

অমল : Please sit down.

[ভিড়ের ভেতর থেকে এগিয়ে আসে দুইজন ব্যবসায়ী কুণ্ডু। বিস্ময়ে বৈষ্ণব বিধায় গলায় কণ্ঠি—সহজ বেশভূষা—খালি পা।]

কেষ্ট কুণ্ডু : ভালো আছেন !

অমল : আঁজ্ঞে হ্যাঁ, এখন বসুন। আরে রূপকুমারী···

কেষ্ট কুণ্ডু : বসতে আর পারি কৈ ! খবরটার জন্যে বিশেষই উতলা আছি। (সঙ্গীর উদ্দেশ্যে) তেনির তো কয়দিন ঘুমই হয় না। আপনে আসবেন আসবেন কইর‍্যা···। অহন খবর টবর··

অমল : খবর, খবর সব ভালো। আপনাদের টাকা মার যাবে না।

মহিন্দর কুণ্ডু : না, সে মারা তো যাইব না হে জানি। অহন ঘরের টাকা উশুল হইয়া মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কিছু আসে, হের লাইগ্যাই না ব্যবসা করতে লামছি। বিশেষ আপনে যখন মধ্যখানে আছেন···

অমল : আমাকে বিশ্বাস করেন তো ?

কেষ্ট কুণ্ডু : দ্যাখেন দেহি, শুনলে দেখি হাস আসে আপনার কথা। এই কি একটা কথা হইল !

অমল : ঠিক আছে, ভাববেন না। তবে যতটা আশা করা গিছল, ততটা হবে না।

কেষ্ট কুণ্ডু : ততটা হইব না কতটা হইব ?

অমল : গিয়ে দেখি ওয়াগন থেকে ঝপ ঝপ করে জল পড়ছে।

কেষ্ট কুণ্ডু : ইস্, তোমারে আমি কই নাই মহীন্দর, ও আলু মারা যাইব। তারপর···

অমল : তারপর আর কি, ওয়াগন না খুলেই তক্ষুনি নীলামে ছাড়লাম মাল ; হাজার, দু-হাজার—যা উশুল হয়ে আসে আর কি !

মহীন্দর কুণ্ডু : ভালোই করছেন।

অমল : বাজারদর তখন আঠারো উনিশ। Retail-এ বিক্রি করেও ওর বেশি দর আপনি পেতেন না।

মহীন্দর কুণ্ডু : তয় তো কামই করছেন।

কেষ্ট কুণ্ডু : [মহীন্দরকে] আপনে মিথ্যাই চিন্তা করেন ; নেন চলেন।

মহীন্দর কুণ্ডু : না না চিন্তা না, তয় দ্যাখেন, এইরকম wholesale কারবার ইয়ার আগে তো করি নাই।

অমল : হ্যাঁ Risk তো আছেই ব্যবসায়।

কেষ্ট কুণ্ডু : 'রিকস্' নাই ? দুই দশ হাজারের জইন্য কেষ্ট কুণ্ডু ডরায় না। তয় কথা কি জানেন, ব্যবসা করতে লাইমা মাইর খাওন কোনো জাত ব্যবসায়ীর লক্ষণ না। হিসাবে ক্যান্ গণ্ডগোল হইব sir ?

অমল : নিশ্চয় নিশ্চয়।

কেষ্ট কুণ্ডু : আইচ্ছা তো চলি স্যার অহন। আপনে বিশ্রাম করেন। অফিস যাইবেন তো ?

অমল : হ্যাঁ দশটায়।

কেষ্ট কুণ্ডু : আইজও দশটায় ! এই আসলেন···

অমল : না ঠিক আছে।

কেষ্ট কুণ্ডু : দ্যাখ মহীন্দর, কর্মযোগী কারে কয়, স্বচক্ষে দ্যাখ।

অমল : [রূপকুমারীকে] কই রূপকুমারী, তোমার relief fund-এ কিছু আদায় করে নাও এই বেলা কুণ্ডু মশাই-এর কাছ থেকে। কুণ্ডু মশাই, আসুন আলাপ করিয়ে দিই, আমাদের রূপকুমারী,

নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই—সম্প্রতি 'সাণ্ডে কা তেল' আর 'কদম কদম'-এ দারুণ নাম করেছেন।

কেষ্ট কুণ্ডু : হেঁ হেঁ, চেনা চেনা লাগে যেন মুখখান মা মণির।

মহীন্দর কুণ্ডু : আরে কত বড় একখান হোর্ডিং নি মারছে বড়বাজারের উপুর।

কেষ্ট কুণ্ডু : হয় হয়, তাইতো! তা কয়েন দেখি কি করতে হইব।

রূপকুমারী : Any sum—Prime Minister's famine relief fund.

কেষ্ট কুণ্ডু : বেশ তো, দিমু অনে। ল্যাখেন্, পাঁচ, না দশ? কত দেওন লাগব?

অমল : পাঁচ দশ কি বলছেন কুণ্ডু মশাই! বুঝতে পারছেন না, Prime Minister's relief fund!

কেষ্ট কুণ্ডু : বেশ তো কয়েন! আর কোনহানে কত লাগব বারবরদারি হে তো আপনেই ভাল জানেন। বসাইয়া নিবেন।

অমল : আপনার একাউন্টে আমি—রূপকুমারী, লেখো পাঁচ শ।

কেষ্ট কুণ্ডু : নন, নন। ঘর থিকা তো আর দিমু না। পাঁচ গদি থিকা উশুল করুম। নন, নন।

অমল : সেটা আপনি যা ভালো বুঝবেন, করবেন।

কেষ্ট কুণ্ডু : বাবুর কথা শুনছ নি মহীন্দর। গোবিন্দ গোবিন্দ! আইচ্ছা তো আসি মা মণি। অমলবাবুর থন্ টাকা দিয়া দিমু অনে।

রূপকুমারী : নমস্তে, নমস্তে।

কেষ্ট কুণ্ডু : নমস্তে।...না দিল আছে মা মণির। সব ফেলাইয়া লামছে তো একটা মহা ব্রত নিয়া। ব্রতই তো! না, কি কও মহীন্দর?

মহীন্দর কুণ্ডু : আইচ্ছা! নিবেদন পাই, আমরা চলি তাইলে অমলবাবু! আসি মা মণি।

[ফোন বেজে ওঠে]

অমল : Yes, speaking, কে? দত্ত?...ভালো ভাই।—এই কিছুক্ষণ হলো।...আচ্ছা, এই between seven and Eight?—পাক্কা!

[রিসিভার নামিয়ে রাখে]

[হোমরা চোমরা দু-জন ব্যবসায়ী বন্ধুর প্রবেশ]

অমল : হ্যালো হ্যালো হ্যালো হ্যালো!

[করমর্দনান্তে কথাবার্তা শুরু হয়]

১ম বন্ধু : তারপর, ওদিককার খবর কি বলুন। নতুন কোনো development হয়েছে?

অমল : Development এই যে দিল্লী থেকে sanction না পেলে এখানে letter of credit খোলাটা সমীচীন হবে না। আমি অবিশ্যি দু-চার দিনের মধ্যেই দিল্লি যাচ্ছি।

২য় বন্ধু : সেই ভালো। মানে কথা এই যে ও আপনি নিজে না গেলে...

অমল : Quota পেয়ে যাব। As a matter of fact টেলিফোনে আমার সঙ্গে Board of Trade-এর সঙ্গে কথাও হয়ে গেছে।

১ম বন্ধু : তবে আর কি!

অমল : ইয়াকুস্থকি খুবই eager. জানিয়েছে Agency পর্যন্ত দিতেও তাদের কোনো আপত্তি নেই।

১ম বন্ধু : ঠিক আছে; lunch-এ দেখা হচ্ছে।

অমল : আচ্ছা!...

[টেলিফোন বেজে ওঠে]

Yes speaking...কে? আরে ব্যানার্জি?—তারপর খবর বলো...আমার!...হ্যাঁ, মোটামুটি ভালোই...হ্যাঁ ভালো, ভালো... আচ্ছা সে হবেখন...বলব, বলব...আরে শোনো, একখানা গাড়ি যে আমার আজকে চাই ভাই...খুব ভালো হয়...O.k.

[রিসিভার রেখে দেয়]

...(রূপকুমারীকে) যাক, তোমার গাড়ির ব্যবস্থাটা হয়ে গেল।

রূপকুমারী : Oh Amal, you are very nice.

অমল : আরে যাও অন্দর যাও...he at home...(নৃত্যশিল্পীকে) এই ডমরুপানি, রূপকুমারীকে বৌদির সঙ্গে ভজিয়ে দিয়ে এসো তো! (রূপকুমারীকে) you might have known him—Dancer Damarupani, বড়ে কলাকার —who composed that famous ballet on Lord Krishna.

রূপকুমারী : আচ্ছা! আপকি composition তো ম্যায় নে বহুৎ পসন্দ কিয়া, বহুৎ artistic হ্যায়।

ডমরুপানি : সুক্রিয়া। চলিয়ে।

[ইতিমধ্যে সস্তা সিনেমা পত্রিকার অপেক্ষমান দু-জন ফটোগ্রাফার ক্যামেরা নিয়ে ছটফটিয়ে ওঠে ছবি নেবে বলে]

অমল : কি, ছবি?—(রূপকুমারীকে) আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, এরা তোমার ছবি নেবে বলছে।

১ম ফটোগ্রাফার : আপনি স্যার একটু দাঁড়ান।

অমল : আবার আমাকে ক্যানো! ··দ্যাখো, পাচ্ছো ঠিক ঠিক।

২য় ফটোগ্রাফার : Wonderful! অপূর্ব angle.

[ফ্ল্যাশ বাল্বের চকিত ঝলকে ছবি তোলা হতে থাকে বিভিন্ন angle থেকে]

পর্দা

ষষ্ঠ দৃশ্য

একই দৃশ্য। রাত্রি। Bouffet খানার সঙ্গে পানীয়েরও ব্যবস্থা আছে। গণ্যমান্য অতিথিরা হাতে হাতে ডিশ নিয়ে খাবার তুলছেন, খাচ্ছেন—ঘুরছেন ফিরছেন জটলা পাকিয়ে। সুবেশ লেডিজরাও আছেন, সুবেশ বেটাছেলে পরিবৃতা হয়ে। ফিলম্ স্টারদের কর্ণাভরণ নিয়ন আলোয় ঝকমকিয়ে উঠছে থেকে থেকে। যেমন হীরের দ্যুতি তেমনি দাঁতের জৌলুস—তেলা মুখ, ভারি 'আই ল্যাস'—লিপস্টিকের মাজা মারা খুনখারাবি রাঙা ঠোঁট। কংশ, বীরেশ, অ্যানি, লতাও সমুপস্থিত সভায়। রঞ্জন সেনকে কেন্দ্র করে এক পাশে একটা ক্ষুদ্র পরিবেশ গড়ে উঠেছে। অমল এসে রঞ্জনকে সম্ভাষণ জানায়।

অমল : আরে রঞ্জন রায়, কতক্ষণ?

রঞ্জন : তোমার সম্ভাষণের অপেক্ষা না রেখেই আপ্যায়িত করছি নিজেকে। you can go and look to others.

অমল : আপনাকে খাতির করছি, এটাই কি আমার কম কাজ!

রঞ্জন : রাসকেল!···

[বেয়ারার ট্রে থেকে পেগ তুলে নেয় রঞ্জন]

···ভালো কথা, অমল···কি করলি?—টাকার?

অমল : হয়ে যাবে।

রঞ্জন : হয়ে তো যাবে বুঝলাম···

মিঃ মল্লিক : [অমলকে] রঞ্জনবাবু তো বুধবার নাগাদ আবার U. K. রওনা হয়ে যাচ্ছেন!

অমল : যাক না। আপনি তো আছেন!

মিঃ মল্লিক : তা আছি···

অমল : তবে আবার কি!

রঞ্জন : না মানে, ব্যাপার আছে। দিচ্ছিসই তো, কাল কি পরশুর ভেতর দিয়ে দে না টাকাটা।

অমল : অসম্ভব।

রঞ্জন : তবে, give me a date then to your conveniance.

অমল : তুই পাবি, on the 12th.

রঞ্জন : পাকা?

অমল : পাকা।

রঞ্জন : ঠিক আচ্ছে। (মল্লিককে) আমি না হয় 15th রওনা হয়ে যাব।···আর শোন, এই অমল! (মল্লিককে দেখিয়ে) এঁকে ফাঁসাচ্ছিস কেন?

অমল : [মল্লিককে] বলুন স্যার।

মিঃ মল্লিক : না না, আর lightly নেবেন না জিনিসটা মিঃ গুপ্ত। আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না, লিমিটেড কোম্পানির ব্যাপার, রায় বাহাদুর পর্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন আপনাদের এই সব কাণ্ডবাণ্ড দেখে। কোম্পানি আপনি লিকুইডেশন-এ দিন, জাহান্নামে দিন, যা খুশি তাই করুন; এখন আমার কথা হচ্ছে, আমি আপনাকে হাতজোড় করে বলছি মিঃ গুপ্ত এতগুলো গণ্যমান্য লোকের সামনে, আপনি যে করে পারেন রায় বাহাদুরের টাকাটা মিটিয়ে দিন। আমার টাকা আপনি না হয় না-ই দিলেন।

অমল : আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন যে আপনি আপনার টাকা পাবেন না!

মিঃ মল্লিক : না না, ও no pious platitudes, enough, enough of it মিঃ গুপ্ত। আমি আর ও সব কথা শুনতে চাই না। তবে জানবেন যে এই মল্লিক ছিল বলে তাই···

অমল : এখন আমি কিছুই জানব না কিছুই শুনব না। This is

not the time and place when I should listen to you all these nonsense.

মিঃ মল্লিক : But tell me where and when Mr. Gupta.

অমল : দেখুন মিঃ মল্লিক, আমারও লিমিটেড কোম্পানির ব্যাপার। কোম্পানিতে আর পাঁচজন ডিরেক্টর আছেন, আপনি তাঁদের বলুন। আমাকেই যে সব করতে হবে, জানতে হবে··· আর as a matter of fact আপনি হয়তো জানেন না, I have already resigned from the board of Directors.

রঞ্জন : But that you can't do.

মিঃ মল্লিক : হ্যাঁ আপনি তা পারেন না মিঃ গুপ্ত।

রঞ্জন : Resignation দিইছি, এ কথাটা বলা চলে না।

অমল : কেন নয় ?

রঞ্জন : Because I being one of your board, have not accepted that as yet.

অমল : বুঝলাম, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি resignation দিই নি।

রঞ্জন : Law does not guarantee it.

অমল : Hang you law. Legality ! কোনো moral-এর বালাই নেই যেখানে সেখানে আবার···

রঞ্জন : I have hanged Law long before you could think of it Amal. And I need not remind you of the laws of an out law.

অমল : Please don't shout Ranjan, I say.

[রঞ্জন Crockery সমেত সামনের টেবিলটা উল্টে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অমলও রঞ্জনকে তাগ করে একখানা প্লেট ছুঁড়ে মারে। দেওয়ালে লেগে প্লেটখানা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। খানাপিনার মাঝখানে এই উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজনার প্রশমন করতে মঞ্চের গভীর থেকে পাক খেতে খেতে সামনে এসে ত্রিতালের লয়ে ছড়িয়ে পড়ে ফিলম্ স্টার রূপকুমারী। সামনে এসে আছড়ে পড়েই পায়ের জিঞ্জিরায় রেখা টেনে আবার মঞ্চের গভীরে চলে যায় রূপকুমারী]

পর্দা

[ক্রমশঃ

ক বি তা গু চ্ছ

চিড়িয়াখানার পশুরাজ

রণজিৎ সিংহ

ছিলে তো মেঘছোঁয়া অরণ্যের একচ্ছত্র অধিপতি
হুঙ্কারে দাপটে টলাতে আযোজন
লেজের নাচে বলিহারি দেমাক
মাটির কলজে ফেড়ে ফোটাতে স্বাক্ষর।

চাঁদোয়া ছিল আকাশ
অর্জুন অশথ দোলাত চামর
হরিণ নেকড়ে বরা রটাত তোমার বন্দনা।

আজ এ কী রূপ!
নেই বাহার নেই তেজ।
শরীরে কাদা, চোখে ছানি, ধুঁকছ হরদম,
পথ্যি কিছু মরা মাস, পানীয় নোংরা জল,
পরিচর্যায় সহায় একমাত্র কল্যাণী সহধর্মিনী।

কি সাধ ছিল ?
কেন ধরা দিলে ফাঁদে ?
মালিকানা বাগালে তাজ্জব খাঁচার ?

এধারে ওধারে স্থবির পারিষদ—চিতা কি হায়েনা

মাঝখানে সেজেছ আজব জীব।
কয়েক পয়সার কয়েক পলকের তামাসা।
ছেলে বুড়ো রগড় করে
শহুরে শৌখীন করে খানিক মস্করা
ছুটিতে হরেক রঙের পাল্লায় জোটে বহুত বাচাল।
ফিরেও দেখ না নেই কৌতুহল,
তুমি ক্লান্ত নির্বিকার লোলচর্ম দার্শনিক।

কোথায় সেই কেশরকলাপ!
কোথায় আযোজন-অহংকৃত-ক্ষুব্ধ মহিমা!

ভুলে যাই স্থান কাল, হাঁকি
'শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর'—
যদি টলে এ আত্মবিস্মরণ, কাটে জরার শৃঙ্খল
যদি জাগো।

একবার দাঁড়াও আপন স্বভাবে বহ্নিমান
ভাঙো হুকুমদারির পরোয়ানা
উপেক্ষায় হাঁকো
গর্জাও—
চিড়ফাড় তল্লাটে ছড়াক ঘোষণা।
থমকাক রাজপথের ব্যস্ততা
কাঁপুন ওই প্রাসাদে প্রাসাদে বিলাসজীর্ণ জীব।

না হয় কাল কাগজে রটবে
'আলিপুর চিড়িয়াখানায় এক পশুরাজের মাথা বিগড়াইয়াছিল।'

কুড়ি লাইন বিতর্ক

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

শূন্যতা বড়োই তীব্র, যেন এক বিশাল শহরে
শব্দহীন হরতাল। ঠিক রাত বারোটা পঁচিশে
আকণ্ঠ মাতাল চাঁদ পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ে;
স্খলিত বাতাসে কার পদশব্দ পুড়ে যায় বাণিজ্যিক বিষে।

যদিচ নিজেকে ঘিরে নাটুকেপনার অপবাদে
ফিটফাট বোলচালে বেশরম কফির দোকান,
মধ্যরাত্রে ঘরে ফিরে তরঙ্গস্তবকে অবসাদে
হৃদপিণ্ডের রক্তস্রোতে কর্দমাক্ত স্বপ্নের সোপান।

কিন্তু মধ্যবর্তী এক অধ্যায়ের খুঁটিনাটি বর্ণনা ভীষণ
বিপন্ন, সরলীকৃত মনে হতে পারে। শিকারের
গল্প শুনে নিরাপদ রোমাঞ্চের মদে কিছুক্ষণ
দেবদাস সেজে, কিংবা যূথচারী শুদ্ধ বিকারের
তৈরীকরা হট্টগোলে হরিবোল দিয়ে, পাঁচ মিনিট
নৈঃশব্দ্য সম্ভোগ ভালো: উচ্চাশার স্তূপীকৃত ইট
প্রাসাদ গড়ে না, শুধু উদ্বাস্তু সর্পের অধিকার
সদম্ভে ঘোষণা করে। আত্মরতি অব্যাহত থাকে।
নির্ভুল শিকার আমি সাম্প্রতিক মনুসংহিতার।
নেশা ছুটে গেলে ঘুম কষ্টসাধ্য নর্দমার পাঁকে।

এ শূন্যতা বড়ো তীব্র, কারণ তা সাময়িক, আরোপিত বলে;
নদী কেবা খুঁজে পায় মানচিত্রবিহীন ভূগোলে!

যেহেতু বয়স

করুণাসিন্ধু দে

বয়স জেগেছে অতলে যাবার, অতলে যাবো।
হাত-পা ছড়িয়ে মজ্জায় খুশি তরঙ্গ তুলে ধাবমান
কড়া-রোদ্দুরে ঘরের অসুখ তুবড়ির মতো ফাটিয়ে আমি
ধোঁয়া ও ধুলিতে গড়াগড়ি দেব, কি ক্ষতি যদি বা বিপথগামী,
যেহেতু আমার ইচ্ছে হয়েছে কপাল খাবার, কপাল খাব।

নিশ্বাসে জ্বালা, আতপ্ত জ্বালা, হৃদয় খুলে
জমাট হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে পোড়াবার মুখে সুখ ঝালাবো,
আহা রে প্রণয় নষ্ট সময়ে দূর পলাতক শীর্ণ রোগী,
ক্ষয়ে ক্ষয়ে কার যৌবন যায়, কতকাল থাকে ভুক্তভোগী,
এবার প্রাপ্তি নিখাদ স্বর্গে নয়তো শ্মশানে ছাই ওড়াবো।

কে রুখে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে, পাঞ্জা কষে,
দৃঢ় দুই হাত, ঘন কেশজাল, দক্ষিণে-বামে পথ ভুলিয়ে
সামনে দাঁড়াবে, পায়ের তলার মাটি ধরে রেখে বুকের হাড়ে;
শিয়রে জেনেছি ঘাতক-বাতাস ডেকে নিয়ে যাবে যম-দুয়ারে,
যেহেতু আমার শিরায় শোণিতে নিমজ্জনের নাগিনী ফোঁসে।

বয়স জেগেছে অতলে যাবার, অতলে যাবো।
যেহেতু আমার ইচ্ছে হয়েছে কপাল খাবার, কপাল খাব।

মৃন্ময়ী বাংলা

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

তোমার চোখে ঝড়ের শুধু, ঝড়ের সংকেত ;
শুধুই বুঝি ভেঙ্গে ভেঙ্গে গড়ার আয়োজন,
মেঘের হৃদয় দীর্ণ হলো, চমকাল বিদ্যুৎ—
তবু সবুজ, সুনীল শোভায় রোমাঞ্চিত বন :

হাজার ছবি আঁকার শেষে হাজার তুলি ভেঙ্গে
নতুন করে যেই দিয়েছি টান—
আমারই রঙ আমার তুলি আমার অজান্তেই
তোমার চোখের ভাষায় দিলে ঝড়ের আহ্বান।

চমকাল বাজ ; ব্যর্থতা আজ ব্যর্থ করে দিলে
অলস আমার স্বপ্ন দেখা চোখ ;
গড়লে কৃষাণ বোনের চোখে, মজুর ভায়ের মুখ—
শহর ও গ্রাম, দুঃখ এবং শোক।

আবার কবে ভাঙ্গবে বুঝি মুছবে আঁকা পট
আবার আমি করব আয়োজন ;
রঙ ফুরোলে রক্ত এবার, ভাঙ্গলে তুলি, মন
মৃন্ময়ী মা !   তোমার মাটি—চিন্ময় স্পন্দন।

ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ

দীনেশ রায়

'আমাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ', এই শিরোনামায় বাংলা ১৩৬৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা মাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায় শ্রীঅশোক রুদ্রের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে লেখক ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপনই শুধু করেন নি, সেগুলির জবাবও দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করতে গিয়ে মার্কসীয় অর্থনীতির অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রকে "অপ্রচলিত" বলে প্রমাণ করতেও সচেষ্ট হয়েছেন।

শ্রীরুদ্র উক্ত প্রবন্ধে যে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন তার সারমর্ম হলো নিম্নরূপ:

১। গত দশ বছরে ভারতের অর্থনীতিতে কিছু কিছু গুণগত পরিবর্তন এসেছে ও আসছে। একটি বিশেষ অর্থে ভারতীয় অর্থনীতি সত্যিই "স্বাবলম্বী" হতে যাচ্ছে।

২। কৃষি-অর্থনৈতিক কাঠামোতে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অদলবদল ঘটেছে। খাদ্যশস্যের প্রকৃত কোনো ঘাটতি এদেশে আর নেই, বেশ অনেক বছরই নেই।

৩। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনসেবামূলক রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বিপুল সম্প্রসারণ ঘটেছে।

৪। গত দশ বছরে জনসাধারণের সমস্ত অংশেরই আর্থিক স্বচ্ছলতা অল্প বিস্তর বেড়েছে। তার মধ্যে আবার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বচ্ছলতা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি বেড়েছে।

৫। পুঁজিতান্ত্রিক সম্প্রসারণশীল পুনঃ উৎপাদনের অগ্রগতির সাথে সাথে শ্রমজীবী জনগণের দুস্থতা বৃদ্ধি পাবে—মার্কস্-এর এই তত্ত্ব সত্য প্রমাণিত হয় নি।

এই প্রবন্ধে আমি শ্রীরুদ্রের চার ও পাঁচ নম্বর বক্তব্যের উপরই প্রধানত আলোচনা করতে চাই। 'ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ', এই শিরোনামায়

১৯৬২ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখের 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় আমার যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমি ১ ও ২ নম্বর বক্তব্যের ওপর কিছুটা আলোচনার চেষ্টা করেছি। প্রয়োজন হলে এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

শ্রীঅশোক রুদ্র সমগ্র প্রশ্নটি বিচারান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, গত দশ বছরে ভারতের সমস্ত শ্রেণীর, মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্ত প্রভৃতির আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে। তার মধ্যে আবার শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের স্বাচ্ছন্দ্য তুলনামূলক ভাবে কিছুটা বেশি বেড়েছে।

লেখকের ভাষায়: "চতুর্থ ও শেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো মধ্যবিত্ত ভদ্র সমাজের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি। মধ্যবিত্ত পাঠকমাত্রই কথাটা পড়েই প্রবল আপত্তি বোধ করবেন। কিন্তু অভ্যস্ত ধারণাকে ভেদ করে সত্যের অনুসন্ধান করলে একথা ধরা পড়বেই যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেটুকু ঘটেছে তাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত কিছু বেশি প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে। প্রবণতাটি উত্তরোত্তরই বাড়বে" (পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৬৯ সাল; পৃষ্ঠা ১০৩১—১০৩২)

লেখকের বক্তব্যে মধ্যবিত্ত পাঠকশ্রেণী এই কারণেই প্রবল আপত্তি বোধ করবেন যে, এই বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তব অবস্থার কোনো মিল নেই। গত ১৭ই আগস্ট তারিখে, ছাঁটাই ও কাজের চাপ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং বেতন ও ভাতা-বৃদ্ধির দাবিতে কলকাতার সওদাগরী অফিসসমূহের কয়েক সহস্র মধ্যবিত্ত কর্মচারীর বিক্ষোভ মিছিলের ভেতর দিয়ে লেখকের বক্তব্যের অসারতা বেশ কিছুটা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

শ্রীরুদ্র বলেছেন যে, অভ্যস্ত ধারণাকে ভেদ করে সত্যের অনুসন্ধান করতে হবে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিই কী সব চাইতে বড় সত্য নয়?

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি সম্পর্কে শ্রীরুদ্রের যে দাবি, তাতে সম্ভবত কংগ্রেস সরকারও বিব্রত বোধ করবেন। কারণ শ্রীরুদ্র যে দাবি করছেন সে দাবি কংগ্রেস সরকারও করেন না। কংগ্রেস সরকার বরং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক অস্বচ্ছলতা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ বোধ করেন।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে পশ্চিম বাংলা সরকার কি বলছেন দেখা যাক। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় বলা হচ্ছে:

"এটা সকলেরই জানা আছে যে, এই রাজ্যের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমবর্ধিত হারে অবনতি ঘটছে, যদিও সামাজিক নেতৃত্ব এখনও এঁদের হাতে রয়েছে এবং আগামী কয়েক দশকের জন্য থাকবে" (পশ্চিম বাংলা সরকারের শ্রম দপ্তর কর্তৃক ১৯৬২ সালে প্রকাশিত 'লেবর ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল—১৯৬১' নামক পুস্তিকা থেকে)। একটু অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে, সমস্ত রাজ্যেই একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

যাই হোক, কোন তথ্যের ভিত্তিতে লেখক এই উপসংহার করলেন যে, মধ্যবিত্তদের আর্থিক স্বাচ্ছল্য বেড়েছে ? উত্তরে তিনি লিখছেন :—

"প্রথমত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্বের প্রকোপ অনেক কমে গেছে। ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে সরকারী চাকুরি বহু পরিমাণ বেড়েছে। ১৯৫০ সালে সরকারী চলতি খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭২৫ কোটি টাকা ; ১৯৬১ সালে তা ১৮২০ কোটি টাকাতে দাঁড়িয়েছে" (পরিচয়, বৈশাখ, ১৯৬৯ ; পৃষ্ঠা ১০৩২)।

চলতি খাতে ব্যয়ের অঙ্ক দেখিয়ে লেখক কি প্রমাণ করতে চাইছেন তা পরিষ্কার নয়। চলতি খাতে ব্যয়ের মধ্যে অনেক জিনিসই পড়ে। অবশ্যই শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাও এই ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু, মধ্যবিত্তদের আর্থিক স্বাচ্ছল্য বেড়েছে, অথবা, এঁদের মধ্যে বেকারত্বের প্রকোপ অনেক কমেছে—এটা প্রমাণ করবার জন্য সরকারী চলতি খাতে ব্যয়বৃদ্ধির অঙ্ক দেখানোই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে না।

একথা অনস্বীকার্য যে বিগত দশকে সরকারী চাকুরি বেশ কিছু পরিমাণ বেড়েছে এবং সরকারী চাকুরির গুণকারক ফল হিসেবে বে-সরকারী চাকুরিও কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু এটা বলাই যথেষ্ট নয়। সাথে সাথে এটাও দেখতে হবে, যে হারে সরকারী এবং বে-সরকারী চাকুরি বেড়েছে, তার চাইতে কয়েক গুণ বেশি হারে চাকুরিপ্রার্থী সৃষ্টি হয়েছে এবং ফলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্বের সামগ্রিক এবং আপেক্ষিক বৃদ্ধি ঘটেছে। এই ঘটনাকে অস্বীকার করার অর্থ বাস্তবকে অস্বীকার করা। মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেকারত্বের প্রকোপ কমছে কি বাড়ছে তা বোঝবার জন্য কোনো অর্থনৈতিক তত্ত্ব উপস্থিত করবার প্রয়োজন পড়ে না। যে কোন সরকারী দপ্তরে অথবা সওদাগরী অফিসে একটু অনুসন্ধান করলেই শ্রীরুদ্র জানতে পারবেন যে কিভাবে একটি, দুটি চাকুরির জন্য শত শত আবেদনপত্র পড়ছে। এই সেদিন পশ্চিমবাংলা সরকারের পুলিশ

বিভাগে ৭২ জন নতুন লোক নিয়োগের কথা ঘোষিত হলে, ৫৫৫০ জন তার জন্য আবেদনপত্র দাখিল করেছিলেন। বেকার সমস্যার তীব্রতা বোঝবার পক্ষে এই তথ্যটিই যথেষ্ট নয় কী ?

মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেকার সমস্যার সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য সরকারী পরিসংখ্যান নেই। ভারতের কর্মসংস্থান বিনিময় কেন্দ্রসমূহের হিসেবে কোনো সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় না, আংশিক চিত্র পাওয়া যায়। কারণ, বেকারদের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র এই সমস্ত কেন্দ্রে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করেন। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কর্মসংস্থান বিনিময় কেন্দ্রসমূহের হিসেবই একমাত্র নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান যার মাধ্যমে সমস্যার গভীরতার একটা চিত্র পাওয়া যায়। এই সমস্ত কেন্দ্রে তালিকাভুক্ত বেকারদের একটা বড় অংশ হচ্ছেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

সারা ভারত কর্মস্থান বিনিময় কেন্দ্রসমূহে তালিকাভুক্ত বেকারদের হিসেব :

সাল	মোট রেজিষ্ট্রেশন	মোট তালিকাভুক্ত বেকার
১৯৫০	১২,১০,৩৫৮	৩,৩০,৭৪৩
১৯৫৫	১৫,৮৪,০২৪	৬,৯৯,৯৫৮
১৯৬০	২৭,৩২,৫৪৮	১৬,০৬,২৪২

১৯৬০ সালে ৩,০৫,৫৫৩ জনকে কর্মসংস্থান বিনিময় কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে কাজ দেওয়া হয়েছিল ; অর্থাৎ যাঁরা ১৯৬০ সালে নিজেদের নাম বেকার হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছিলেন তাঁদের শতকরা ১১জন মাত্র কাজ পেয়েছিলেন।

পশ্চিমবাংলার অবস্থা

কর্মসংস্থান বিনিময় কেন্দ্রসমূহে তালিকাভুক্ত বেকারদের সংখ্যা :

১৯৫১	৫৫,০০০
১৯৫৫	১,১২,০০০
১৯৬১	৩,২৮,২৯১

তালিকাভুক্ত (পশ্চিমবাংলা) শিক্ষিত বেকারের হিসাব

(ম্যাট্রিক, ইণ্টারমিডিয়েট ও ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল গ্রাজুয়েট সমেত পোষ্ট গ্রাজুয়েট) :

সাল	মোট রেজিষ্ট্রেশন
১৯৬০	৬৮,৭৩১
১৯৬১	৬৯,৮০৫

১৯৬১ সালে কর্মসংস্থান বিনিময় কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে মোট ৪২৫৭ জন শিক্ষিত বেকারকে কাজ দেওয়া হয়েছিল; অর্থাৎ, যাঁরা নাম লিখিয়েছিলেন তাঁদের শতকরা ৬·১জন মাত্র কাজ পেয়েছিলেন।

কর্মসংস্থান বিনিময় কেন্দ্রের হিসাবসমুহ নেওয়া হয়েছে ভারত সরকার এবং পশ্চিমবাংলা সরকারের শ্রমদপ্তর কর্তৃক পরিবেশিত পরিসংখ্যান থেকে।

কর্মসংস্থানের প্রশ্নের এই দিকটি, অর্থাৎ চাকুরিপ্রার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির দিকটি শ্রীরুদ্রের দৃষ্টি কি করে এড়িয়ে গেল তা বোঝা যায় না।

এইবার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির প্রশ্নে আসা যাক। যে তথ্য অথবা যুক্তিই দেওয়া হোক না কেন, ঘটনা হচ্ছে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পনেরো বছর পরেও ভারতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছেন। সরকারী পরিসংখ্যানেও একথা স্বীকৃত।

মধ্যবিত্ত পরিবারদের মাসিক আয় (১৯৫৮-৫৯)

মাসিক আয় গোষ্ঠী (টাকা হিসাবে)		মোট পরিবারের কত জন (শতাংশ হিসাবে)		
		বোম্বাই	কলকাতা	দিল্লী
৭৫—৩০০	...	৫৫,৫৯	৬৭.৪৫	৫২.৮২
১৫০০ ও তদূর্ধ	...	১.৩২	১.৮৭	১.৯৬

[সূত্র—ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পরিসংস্থান সংস্থার শ্রম-পরিসংখ্যান দপ্তর]

এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাবে যে, বোম্বাই, কলকাতা এবং দিল্লীর মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহের যথাক্রমে শতকরা ৫৫·৫৯ জনের, ৬৭·৪৫ জনের ও ৫২·৮২ জনের মাসিক আয় ৭৫ টাকা থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এই সমস্ত পরিবার দারিদ্র্যের প্রান্তসীমায় বাস করেন। অপর দিকে, ১৫০০ টাকা ও তদূর্ধ্ব মাসিক আয়, এমন পরিবারের সংখ্যা (মোট পরিবারের) হচ্ছে, যথাক্রমে শতকরা ১·৩২টি, ১·৮৭টি এবং ১·৯৬টি। একথা বলা চলে যে, এই মুষ্টিমেয় পরিবারসমূহের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, তাহলে কি মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের রোজগার বাড়েনি? ঐ রোজগার নিশ্চয়ই কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু কংগ্রেস সরকার স্বেচ্ছায় ঐ রোজগার বাড়িয়ে দেন নি। সামান্য বেতন এবং ভাতার বৃদ্ধির জন্যও গত দশ বছরে কর্মচারীদের, তাঁদের ইউনিয়ন অথবা সমিতির নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম ও আন্দোলন করতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি পাঠকদের, কেন্দ্রীয় সরকারী

কর্মচারীদের ১৯৬০ সালের সাধারণ ধর্মঘট, পশ্চিমবাংলা সরকারের কর্মচারীদের দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন; ব্যাঙ্ক ও সওদাগরী অফিসের কর্মচারীদের আন্দোলন, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের আন্দোলন ইত্যাদির কথা স্মরণ করতে বলব। এই সমস্ত আন্দোলনের ফলেই কিছুটা বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু গত দশ বছরে, বিশেষ করে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার পাচ বছরে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির মূল্যের অনবরত ঊর্ধ্বমুখী গতির দরুণ, দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম ও আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত লাভ বহুলাংশে নষ্ট হয়ে গেছে। গত পাঁচ বছরে কর্মচারীদের আর্থিক রোজগার এবং প্রকৃত রোজগারের মধ্যেকার ব্যবধান বেশ কিছু বেড়ে গেছে, অর্থাৎ, প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছে এবং আরও পাচ্ছে। ফলে, জীবনধারণের ন্যূনতম চাহিদা মেটাবার জন্যও কর্মচারীদের ঋণের আশ্রয় গ্রহণ করতে হচ্ছে। শুনলে আজগুবি মনে হবে; কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের শতকরা ৯০ জনই "ঋণগ্রস্ত"। স্বাধীনতা পত্রিকার স্তম্ভেই বেরিয়েছে, কলকাতার লালদিঘি অঞ্চলের একটি সওদাগরী অফিসের দুই শত কর্মচারীর মধ্যে ১৬০ জন হলেন করণিক। এই ১৬০ জন করণিকের মধ্যে ১৫০জনই ঋণগ্রস্ত।

রোজগার বৃদ্ধির নমুনাটা কি? পশ্চিমবাংলার সরকারী কর্মচারীদের কথাই ধরা যাক। পশ্চিমবাংলা সরকারের অধীনে ২ লাখ ১২ হাজার কর্মচারী কাজ করেন। এঁদের শতকরা ৬৬ জনেরই মাসিক আয় সর্বসাকুল্যে ৫০ টাকার মধ্যে। এটা ১৯৫৭ সালের হিসাব। ১৯৬২ সালেও এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে নি।

গত কয়েক বছর ধরে কর্মচারীরা তাঁদের বেতন ও ভাতার হার সংশোধনের জন্য "বেতন কমিশন" নিয়োগের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু সরকার প্রথম দিকে তাঁদের দাবি গ্রাহ্য করেন নি। অবশেষে, কর্মচারীদের বিক্ষোভ শান্ত করার উদ্দেশ্যে "বেতন কমিশনের" পরিবর্তে "বেতন কমিটি" নিয়োগ করা হলো। "বেতন কমিটি" নিম্নতম কর্মচারীদের জন্য যে বেতন মান নির্ধারিত করলেন তার দ্বারা তাঁদের বেতন মানের কোনোই উন্নতি হয় নি। বেতন কমিটি কর্তৃক নূতন বেতন মান নির্ধারিত করার ফলে নিম্নতম কর্মচারীদের গড়ে মাসিক তিন টাকা মাত্র বেতন বৃদ্ধি হবে। কলকাতা ও হাওড়ার সদর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই বেতন বৃদ্ধি হবে এক টাকা মাত্র।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে আমার কথা হচ্ছে, এঁদের আর্থিক উপার্জন সামান্য কিছু বাড়লেও, গত দশ বছরে অর্থনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে এবং আগামী দিনে উপার্জন কিছুটা বাড়লেও অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটবে না বরং আরও অবনতি ঘটবার সম্ভাবনাই বেশি।

শ্রীরুদ্রের প্রবন্ধের শেষাংশ হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এইখানে তিনি তাঁর সমগ্র বক্তব্যের তত্ত্বগত রূপ দিয়েছেন।

লেখক এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার অগ্রগতির সাথে সাথে শ্রমজীবী জনগণের দুঃস্থতা বৃদ্ধি পায়—মার্কস-এর এই তত্ত্ব সত্য প্রমাণিত হয় নি। তিনি এই কথা শুধু ভারতবর্ষ সম্পর্কেই বলছেন না, ভারতবর্ষসমেত সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়া সম্পর্কেই বলছেন। লেখকের মতে মার্কসীয় অর্থনীতির এই সূত্রটি, আজ নয় বিংশশতকের গোড়া থেকেই নাকি অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

শ্রীরুদ্র লিখছেন :

"মার্কস ধারণা করেছিলেন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এ-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক জনসাধারণ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে উঠবে এবং শেষপর্যন্ত নিষ্পেষণ যখন অসহ্য হয়ে উঠবে তখন শ্রেণীবদ্ধ শ্রমিকজনতা, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দরুণ এই নিষ্পেষণ, তাকে ভাঙতে উদ্যত হবে। এইভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও উৎপাদকশক্তিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ধনিক ও শ্রমিকের সংঘর্ষের রূপ নেবে।

"কিন্তু মার্কস-এর pauperisation-এর ভবিষ্যৎ দর্শন সত্য প্রমাণিত হয় নি। (যদিও বলাই বাহুল্য তাতে মার্কসবাদ বিজ্ঞান হিসেবে বাতিল হয়ে যায় না)। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে, অন্তত বিংশশতকের গোড়া থেকে, এই প্রবণতা বিদূরিত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে আলাদা আলাদা না করে দেখে যদি সমগ্র ধনতান্ত্রিক দুনিয়াকে এক সঙ্গে দেখা যায় তাহলে অবশ্য এই সেদিন পর্যন্ত pauperisation-এর থিয়োরি সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে এসেছে। কারণ উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আওতার বাইরে গোটা যে ঔপনিবেশিক জগৎ—তাতে জনসাধারণের জীবনমান ক্রমশই অবনত হয়েছে এবং তাদের শোষণের অংশভুক্ত হয়েই উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীও, নিজেদের জীবনমান উন্নত করতে পেরেছে। কিন্তু গত দশ বছরের ইতিহাসে দেখেছি, ভারতবর্ষের মতো দেশেও ধনতান্ত্রিকব্যবস্থার এই মোড় ফিরিয়ে দেওয়া গেছে। স্বল্প

হারেই হোক, শ্রমিক সাধারণের জীবনমান অবনত না হয়ে উন্নতই হয়েছে এবং এই স্বল্পহারের প্রগতি আরও বিশ-পঁচিশ বছর চালিয়ে নেওয়ার মতো কিছু কিছু গুণগত পরিবর্তন অর্থনীতিতে এসে গেছে" (পরিচয়—বৈশাখ, ১৩৬২; পৃষ্ঠা ১০৩৪-১০৩৫)।

পাঠকদের সুবিধার জন্য লেখকের প্রবন্ধ থেকে আমি বিস্তারিত উদ্ধৃতিই দিলাম।

বিংশশতকের গোড়া থেকে পুঁজিবাদের চরিত্র পাল্টে গেছে, পুঁজিবাদ প্রগতিশীল রূপ নিয়েছে সুতরাং মার্কসবাদ অপ্রচলিত হয়ে গেছে (লেখক অবশ্য বলেছেন যে, মার্কসবাদ বিজ্ঞান হিসেবে বাতিল হয়ে যায় না)—পরিষ্কার প্রকাশ না করলেও লেখকের বক্তব্যের মধ্যে যেন এই সুরই ফুটে উঠেছে। তবে শ্রীরুদ্রের প্রবন্ধের এই সুরের মধ্যে মৌলিকত্ব কিছু নেই।

"জনগণের পুঁজিবাদ" তত্ত্বের জন্মস্থান হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এই তত্ত্বের নায়ক হচ্ছেন ভারতস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক গেলব্রেথ, অধ্যাপক জনসন, অধ্যাপক ক্রম প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ। আজ বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে পুঁজিবাদকে এই নতুন পোশাকে উপস্থিত করা হচ্ছে।

"জনগণের পুঁজিবাদ" তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে; যে বেশেই উপস্থিত করা হোক না কেন, পুঁজিবাদের চরিত্র তাতে পালটিয়ে যায় না।

উৎপাদনের উপায়গুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানা, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ, শ্রমশক্তির পণ্যতে পরিণত হওয়া, আয় ও সম্পদ একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত ও পুঞ্জিভূত হওয়া, শ্রমজীবী জনগণের দুর্দশা বৃদ্ধি পাওয়া—পুঁজিবাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলি বদলিয়ে যায় না।

মার্কসবাদকে অপ্রচলিত বলে প্রমাণ করার চেষ্টাও নতুন কিছু নয়। মার্কসবাদ অথবা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম থেকেই তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে জেহাদ ঘোষণা এবং তাকে অপ্রচলিত বলে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চলে আসছে। কিন্তু কোনো প্রচেষ্টাই মার্কবাদের, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের অগ্রগতি রোধে সক্ষম হয় নি।

এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, মার্কসীয় অর্থনীতির বিশেষ সূত্রটিকে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদদের একাংশ

বিকৃতভাবে উপস্থিত করে থাকেন। এঁরা বিষয়টি এমনভাবে উপস্থিত করেন যেন মার্কস বলেছিলেন যে, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগতির সাথে সাথে শ্রমজীবী জনগণের দুস্থতা নিরবিচ্ছিন্ন গতিতে এবং ক্রমবর্ধিত হারে বাড়তে থাকবে, যেন এই দুস্থতা একই গতিতে বছরের পর বছর, দশকের পর দশক বেড়ে চলবে, তার কোনো উত্থান পতন হবে না, ইত্যাদি।

বলাই বাহুল্য এটা মার্কসীয় অর্থনীতির বিকৃত ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রীরুদ্র সচেতন ভাবে বিকৃত করছেন অথবা অপব্যাখ্যা করছেন তা আমি বলি না। তবে বিনীত ভাবে আমি এটা বলব যে, মার্কসীয় অর্থনীতির এই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটির তিনি যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তা আদৌ সঠিক নয়।

মার্কস, শ্রমজীবী জনগণের দুস্থতা বৃদ্ধিকে পুঁজিতান্ত্রিক সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদনের একটি সাধারণ ঝোঁক হিসাবে দেখিয়েছেন। এই দুস্থতা নিরবচ্ছিন্ন গতিতে এবং ক্রমবর্ধিত হারে বছরের পর বছর বেড়ে যাবে, একথা মার্কস বলেন নি। এই সাধারণ ঝোঁক বিভিন্ন দেশে একই ভাবে দেখা দেবে, একথাও তিনি বলেন নি, বরং তিনি বিপরীত কথাই বলেছিলেন।

প্রথম খণ্ড কেপিটালের 'পুঁজিতান্ত্রিক সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদনের সাধারণ নিয়ম' (General Law of Capitalist Accumulation) নামক অনুচ্ছেদে মার্কস লিখেছেন :

"সামাজিক সম্পদ ও সক্রিয় পুঁজির পরিমাণ যত বেশি হতে থাকে, পুঁজির প্রসার ও শক্তি যত বাড়তে থাকে এবং সেইজন্যই শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা ও তাঁদের শ্রমের উৎপাদনক্ষমতাও যত বাড়ে, ততই শিল্পে নিয়োগক্ষম মজুত শ্রমিকের সংখ্যা (Industrial reserve army) বেশি হতে থাকে। যে সব কারণে পুঁজির বিপুল ক্ষমতার বিকাশ ঘটে, সেই সব কারণেই পুঁজিপতিরা কাজে লাগাতে পারে এমন শ্রমশক্তিরও বিকাশ ঘটে। তাই, সম্পদের স্থিতিশক্তির (Potential energy) সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে নিয়োগক্ষম মজুদ শ্রমিকসংখ্যা আপেক্ষিক বেড়ে যায়। কিন্তু এই শিল্পে নিয়োগক্ষম মজুত শ্রমিকবাহিনীর সংখ্যা শিল্পে নিযুক্ত কার্যরত শ্রমিকবাহিনীর তুলনায় যত বেশি হতে থাকে, তত বাড়তি জনসংখ্যার মোট পরিমাণ বেড়ে যেতে শ্রম যত পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে সম-অনুপাতেই এদের দুর্দশা বাড়তে থাকে। শেষকথা, শ্রমিকশ্রেণীর কুষ্ঠাদি জঘন্য রোগাক্রান্তদের স্তর এবং শিল্পে নিয়োগক্ষম মজুত শ্রমিকবাহিনীর সংখ্যা যত প্রসার লাভ করে তাদের দুস্থতাও তত বেড়ে যায়।

এই হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদনের অমোঘ সাধারণ নিয়ম। অন্যান্য নিয়মেরও মতো কার্যক্ষেত্রে নানাবিধ পরিস্থিতির দরুন প্রকারান্তর ঘটতে পারে।" [কার্ল মার্কস : কেপিটাল; ১ম ভল্যুম, পৃ ৬৪৪।

কোনো কোনো পরিস্থিতিতে এই সাধারণ নিয়মের কার্যক্ষেত্রে প্রকারান্তর ঘটতে পারে তা মার্কস কেপিটালের অন্য একটি অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করে গিয়েছেন।

মার্কস একই অনুচ্ছেদে আরও লিখেছেন :

"পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমের সামাজিক উৎপাদনক্ষমতা উন্নত করার সমস্ত পদ্ধতিই প্রবর্তিত হয় ব্যক্তি হিসেবে শ্রমিকের ক্ষতিসাধন করে। উৎপাদন উন্নত করার সমস্ত উপায়গুলিই উৎপাদকের উপর আধিপত্য করার এবং তাদের শোষণ করার উপায়ে পরিণত হয়ে পড়ে; ঐগুলো শ্রমিকের সত্তাকে এমনভাবে খণ্ডিত করে যে, সে নামেমাত্র মানুষ থাকে, সে যন্ত্রের অংশের পর্যায়ে অবনত হয়ে পড়ে ও তাঁর কাজের প্রতি আকর্ষণ থাকতে পারে এমন সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যায় এবং খাটুনি তার কাছে ঘৃণ্য জিনিস হয়ে পড়ে। শ্রমপ্রক্রিয়ার সঙ্গে বিজ্ঞানকে একটি স্বাধীন ক্ষমতা হিসাবে যত যুক্ত করা হয় সেই অনুপাতে শ্রমিকের পক্ষে শ্রমপ্রক্রিয়ায় তাঁর বুদ্ধিগত সম্ভাবনাসমূহের প্রয়োগকে বাহুল্য করে তোলে; ঐগুলি যে অবস্থার মধ্যে শ্রমিক কাজ করেন তাকে বিকৃত করে শ্রমপ্রক্রিয়ায় সময় শ্রমিককে এমন একজন স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের অধীনস্থ করে দেয়, সে কর্তৃত্ব তার নীচতার দরুন আরও বেশি ঘৃণ্য হয়; শ্রমিকের সমগ্র জীবনকালই তার পক্ষে কাজের সময় হয়ে পড়ে, তাঁর স্ত্রী, পুত্রকেও পুঁজির চাকার তলায় টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু বাড়তি মূল্য উৎপাদনের সমস্ত পদ্ধতি হচ্ছে একই সঙ্গে সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদনেরও পদ্ধতি এবং ঐ সমস্ত পদ্ধতির উন্নয়ন সাধনের উপায়। যা বলা হলো তা থেকে অনিবার্যভাবে বেরিয়ে আসে যে পুঁজিতান্ত্রিক সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতেই শ্রমিকের ভাগ্য— তা তার পারিশ্রমিক বেশি হোক, বা, কম হোক না কেন—অধিকতর শোচনীয় হয়ে পড়বেই। শেষ কথা, সে নিয়মানুযায়ী, আপেক্ষিকভাবে বাড়তি জনসংখ্যা কিংবা শিল্পে নিয়োগক্ষম মজুদবাহিনী, সব সময়ে সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদনের সম-অনুপাতিক হারেই সেই নিয়ম দিয়ে গেঁথে রাখার

মতো শ্রমিককে দৃঢ়ভাবে পুঁজির সঙ্গে গেঁথে রাখে; এই বাঁধন হে ভলক্যান কীলক প্রোমিথিউসকে পাহাড়ের সঙ্গে যত দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করে রেখেছিল তার থেকেও দৃঢ়তর। ইহা পুঁজির সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্দশারও সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদন প্রতিষ্ঠিত করে। পুঁজির সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রান্তদেশে সম্পদ ক্রমাগত বর্ধিত পরিমাণে পুঞ্জিভূত হয়ে পড়তে থাকে এবং সেইজন্যই, সঙ্গে সঙ্গে অপর প্রান্তদেশে দুর্দশা, অত্যন্ত যন্ত্রণাবহুল খাটুনি, দাসত্ব, জ্ঞানহীনতা, পশুবৎ জীবন, মানসিক অধঃপতন, ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে; এই প্রান্ত দেশে অবস্থান করে সেই উৎপাদক শ্রেণী যাদের উৎপন্ন দ্রব্য পুঁজির আকার গ্রহণ করে থাকে।" [কার্ল মার্কস: কেপিটাল পৃঃ ৬৪৫]

বক্তব্যটি অত্যন্ত পরিষ্কার। এখানে দুই অর্থ করার কোনো সুযোগ নেই। শ্রমজীবী জনগণের দুস্থতা বৃদ্ধি হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক সম্প্রসারণশীল পুনঃউৎপাদনের সাধারণ অমোঘ নিয়ম। অন্যান্য নিয়মের ন্যায় এই নিয়মটিরও, কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে প্রকারান্তর ঘটতে পারে, কিন্তু তাতে করে নিয়ম পরিবর্তিত হয়ে যায় না।

যে যে কারণে এই সাধারণ নিয়মটির প্রকারান্তর ঘটতে পারে তার মধ্যে একটি মূল কারণ হলো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সম্প্রসারণ। ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন কোনো কোনো সময়ে কোনো কোনো দেশে আর্থিক মজুরি কিছুটা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে। ভারত সমেত সমস্ত পুঁজিবাদী দুনিয়ার ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য।

শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ফলে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তাঁদের আর্থিক আয় কিছুটা বাড়াতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত আয় হ্রাস ও ফলে দুস্থতার সামগ্রিক বৃদ্ধি—ভারতবর্ষেরও এটাই হচ্ছে সাধারণ ঝোঁক।

ভারত সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীনন্দাকে, ১৯৬০ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে লোকসভায় প্রদত্ত এক বক্তৃতায় স্বীকার্য করতে হয়েছিল:

"১৯৩৯ ও ১৯৪৭ সালের মধ্যে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৫১ সালে তাঁরা তাঁদের হৃতস্থান পুনরুদ্ধার

করতে পেরেছিলেন। ১৯৫৬ সালে প্রকৃত মজুরি শতকরা ১৫ ভাগ বেড়েছিল। কিন্তু ১৯৫৬ সাল, যখন থেকে আবার মূল্যবৃদ্ধি শুরু হলো, তখন থেকে শ্রমিকদের লাভ বেশ কিছুটা নষ্ট হয়ে গেল" (লোকসভার কার্যবিবরণী—১১ এপ্রিল, ১৯৬০)।

ভারত সরকারের পরিসংখ্যান থেকেই দেখা যাবে যে, ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৫৯ সালে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরির সূচী শতকরা দু ভাগ মাত্র ওপরে ছিল এবং ১৯৫৫ সালের পর থেকে তা নিরবচ্ছিন্ন গতিতে হ্রাস পেয়ে গেছে।

শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত মজুরির সূচী ভিত্তি

[১৯৪৭=১০০]

১৯৫৫—১৪৪.৯

১৯৫৬—১৩৪.৬

১৯৫৭—১৩৩.৫

১৯৫৮—১২৫.৬

১৯৫৯—১২৩.৯

[সূত্র—ভারত সরকারের শ্রমদপ্তর কর্তৃক প্রচারিত "ভারতের শ্রম পরিসংখ্যান, ১৯৬১"]।

পরবর্তী দু বছরের কোনো সরকারী হিসেব নেই। কিন্তু এটা স্বীকৃত যে ১৯৬০ এবং ১৯৬১ সালেও প্রকৃত মজুরির হ্রাসের গতি অব্যাহত আছে।

আমার বিশ্বাস, মার্কসীয় অর্থনীতির বিশেষ সূত্রটির সঠিক ব্যাখ্যা এবং আজিকার পুঁজিবাদী দুনিয়ার পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ—এই দু-এর ওপর নির্ভর করলে লেখক এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতেন যে, একশো বছর আগে মার্কস যা লিখে গিয়েছিলেন তা আজকের পরিস্থিতিতেও সম্পূর্ণ প্রচলিত আছে।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমজীবী জনগণের দুস্থতার সামগ্রিক বৃদ্ধির কথাই শুধু মার্কস বলেন নি, তিনি আপেক্ষিক (রিলেটিভ) বৃদ্ধির কথাও বলে গিয়েছেন। অর্থাৎ, প্রকৃত আয় একই রকম থাকতে পারে অথবা কিছুটা বাড়তেও পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপেক্ষিক আয় কমে যেতে পারে এবং ফলে দুস্থতা বেড়ে যেতে পারে। 'মজুরি, শ্রম ও পুঁজি' নামক পুস্তকে মার্কস লিখেছেন:

"প্রকৃত মজুরি একই রকম থাকতে পারে, এমন কি বাড়তেও পারে, কিন্তু তথাপি আপেক্ষিক মজুরি হ্রাস পেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ধরে নেওয়া যাক, জীবনধারণের সমস্ত উপাদানের দর তিন ভাগের দু ভাগ হ্রাস পেয়েছে কিন্তু মজুরি হ্রাস পেয়েছে তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র, অর্থাৎ বলা যেতে পারে তিন মার্ক থেকে দু মার্ক হয়েছে। পূর্বে তিন মার্ক দিয়ে একজন শ্রমিক যে পণ্য ক্রয় করতে সক্ষম হতেন এখন এই দু মার্ক দিয়ে তার চাইতে বেশি পরিমাণ পণ্য ক্রয় করতে পারবেন বটে কিন্তু তথাপি পুঁজিপতিদের মুনাফার তুলনায় তাঁর মজুরি হ্রাস পেয়েছে।

পুঁজিপতির (কারখানার মালিক) মুনাফা এক মার্ক বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ সে শ্রমিককে যে ক্ষুদ্রতর বিনিময় মূল্য দিচ্ছে তার বিনিময়ে অবশ্যই শ্রমিককে পূর্বের চাইতে বৃহত্তর বিনিময় মূল্য উৎপাদন করতে হবে। শ্রমের অংশের তুলনায় পুঁজির অংশ বেড়েছে। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সামাজিক সম্পদ বণ্টন আরও বেশি অসম হয়েছে। সমপরিমাণের পুঁজির সাহায্যে পুঁজিপতি শ্রমের উপর বেশি পরিমাণে আধিপত্য করতে পারছে। শ্রমিক-শ্রেণীর ওপর পুঁজিপতিশ্রেণীর ক্ষমতা বেড়েছে, শ্রমিকদের সামাজিক সংস্থিতির (social position) অবনতি ঘটেছে, তাঁদের সংস্থিতি পুঁজিপতিদের আরও এক ধাপ নিচে নেমে গেছে" (মার্কস-এঙ্গেলস—সীলেকটেড ওয়ার্কস, ১ম ভল্যুম, পৃষ্ঠা ২১৭ ।)

মার্কস কর্তৃক বর্ণিত এই নিয়মটি কি অপ্রচলিত হয়ে গেছে? না হয় নি। ভারত সমেত সমস্ত পুঁজিবাদী দুনিয়ার ক্ষেত্রে এটা আজও সম্পূর্ণ প্রচলিত আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রমজীবী জনগণের দুস্থতার আপেক্ষিক বৃদ্ধি সম্পর্কে মার্কস-এর এই কথাগুলি শ্রীরুদ্র উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি।

দুঃস্থতার আপেক্ষিক বৃদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঘটতে পারে। দেখা যাবে, শিল্পোৎপাদনের মূল্যে শ্রমিক-কর্মচারীর প্রাপ্য অংশ কমছে এবং সেই অনুপাতে পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রাপ্য অংশ বাড়ছে; ফলে, শ্রমিক-কর্মচারীর আর্থিক অবস্থার আপেক্ষিক অবনতি ঘটছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই ঝোঁকটি খুবই স্পষ্ট।

ভারতের কারখানা শিল্পের উৎপাদনের নীট মূল্যে শ্রমিক-কর্মচারী ও পুঁজিপতিদের অংশ।

মোট মূল্যের শতাংশ হিসাবে

	শ্রমিক-কর্মচারীর অংশ	পুঁজিপতির অংশ
১৯৫০	৬০·৬	৩৯·৪
১৯৫৫	৫৫·১	৪৪·৯
১৯৫৮	৫৪·২	৪৫·৮

[সূত্র—ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ২৯টি কারখানা শিল্পের সেন্সাস]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ১৯৫০-৫৮ সালের মধ্যে উৎপাদনের নীট মূল্যে শ্রমিক-কর্মচারীর অংশ শতকরা ৬০·৬ ভাগ থেকে কমে শতকরা ৫৪·২ ভাগ হয়েছিল; একই সময় পুঁজিপতিদের অংশ শতকরা ৩৯·৪ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা ৪৫·৮ ভাগ হয়েছিল।

তার অর্থ অবশ্যই এটা নয় যে, শ্রমিক-কর্মচারীর অংশ নিরবচ্ছিন্ন গতিতে এবং ক্রমবর্ধিত হারে কমে গেছে। দু-এক বছর এর নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। কিন্তু সাধারণ ঝোঁকটি হচ্ছে, শ্রমিকদের অংশ হ্রাস এবং পুঁজিপতিদের অংশ বৃদ্ধির দিকে।

শ্রমিকদের মাথাপিছু উৎপাদন এবং সাথে সাথে প্রকৃত মজুরিও বাড়ছে; কিন্তু মাথাপিছু উৎপাদন যে হারে বাড়ছে তার চাইতে অনেক কম হারে প্রকৃত মজুরি বাড়ছে; ফলে, প্রকৃত মজুরির আপেক্ষিক হ্রাস ঘটছে।

শ্রমিকদের মজুরি না বাড়িয়ে, তাঁদের উপর কাজের চাপ বৃদ্ধি করে বৃহৎ উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদিত হচ্ছে; কিন্তু এই উদ্বৃত্তমূল্যের খুবই সামান্য অংশ শ্রমিকরা পাচ্ছেন। এই ভাবে বছরের পর বছর শ্রমিকদের উপর পুঁজিপতিদের শোষণের মাত্রা বেড়েই চলেছে। এটাও মার্কস কর্তৃক নির্দেশিত পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার একটি সাধারণ নিয়ম যা প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের শ্রম ও কর্মসংস্থান দপ্তরের শ্রীদাতার ...তিক এক নোটে (এই নোটের পূর্ণ বয়ান বোম্বাই-এর 'ইকনমিক উইকলি, বিশেষ সংখ্যা ১৯৬১'-এ প্রকাশিত হয়েছে) বলেছেন যে, "১৯৪৭ সালের তুলনায় ১৯৫৮ সালে শ্রমিকদের মাথা গ্রস উৎপাদন যেখানে বেড়েছে শতকরা ৫৩ ভাগ, তাঁদের প্রকৃত মজুরি সেখানে শতকরা ২৭ ভাগ মাত্র বেড়েছে।

শোষণের মাত্রা যে কি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পুঁজিপতিরা, শ্রমিকদের প্রকৃত আয় নিচের দিকে রেখে যে কি বিপুল পরিমাণে মুনাফা অর্জন করেছে তা শ্রীদাতার কর্তৃক পরিবেশিত তথ্য থেকে কিছুটা বোঝা যায়।

শ্রীরুদ্র তাঁর প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন :

"প্রশ্নটা এখানে উঠছে pauperisation-এর দরুন জনসাধারণের যে বিপ্লবী চেতনার উন্মেষের আশা মার্কস করেছিলেন, pauperisation-এর অনুপস্থিতিতে তা কি উপায়ে সাধিত হবে" [পরিচয়—বৈশাখ, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ১০৩৫]।

আমার মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই আমি এতক্ষণ চেষ্টা করেছি। সুতরাং এখানে নূতন করে উত্তর দেবার কিছু নেই। এখানে আমি যে কথাটা বলতে চাই তা হচ্ছে—মার্কসবাদীরা "অনাহারের মাধ্যমে বিপ্লব"-এর তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। মার্কসবাদীরা মনে করেন না যে ভিখারীদের নিয়ে বিপ্লব হতে পারে।

পাঠকগোষ্ঠী

'পরিচয়'-সম্পাদক সমীপেষু,

বর্ষ ৩১, সংখ্যা ৯ 'পরিচয়'-এ শ্রীযুত নীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বাঙলা-ফাউস্ত সম্পর্কে আলোচনাটি পাঠ করে যে দু' একটি কথা মনে হলো তা প্রকাশ করার লোভ সামলাতে পারলাম না। অনুগ্রহ করে এই পত্রটি আপনাদের পত্রিকাস্থ করলে সবিশেষ আনন্দিত হব।

শ্রীরায় তাঁর আলোচনার সূত্রপাতে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব সম্পর্কে বলেছেন : "বাংলা দেশের বাহিরে না গিয়া ও জার্মান ভাষার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবেও ওদুদ সাহেব গ্যেটে-অনুরক্তির যে আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর।" "জার্মান ভাষার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়" বলতে শ্রীরায় কি বোঝাতে চেয়েছেন, সঠিক বুঝলাম না। তবে, ওদুদ সাহেবের মুখে আমি যতদূর শুনেছি তাতে জানি, তিনি দীর্ঘ কুড়ি-পঁচিশ বছর জার্মান ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়নে রত ছিলেন। আর সেই অধীত বিদ্যা ও উপলব্ধির নিদর্শন তাঁর—"কবিগুরু গ্যেটে।" সুতরাং এ-ধরনের কোনও ব্যক্তিগত উক্তির পূর্বে সম্যক্ বিষয়জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল না কি? হাইপথেসিসের অসঙ্গত মাত্রাধিক্য বিশেষ কোনও একটি মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হয় বলে শুনেছি।

বাঙলা-ফাউস্তের অনুবাদক শ্রীযুত কানাইলাল গাঙ্গুলী মহাশয়ের সম্পর্কে শ্রীরায় মন্তব্য করেছেন : "...ফাউস্ত-অনুবাদের যে দুরূহ সাধনায় কানাইবাবু প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সিদ্ধির জন্য কেবল জার্মান ভাষাতে দক্ষতা যথেষ্ট নয়, আপন মাতৃভাষার মাধ্যমেও তাহার একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন ছিল।" শ্রীরায়ের এই আর একটি বোধহয় রোমহর্ষক আবিষ্কার যে, শ্রীগাঙ্গুলী আপন মাতৃভাষায় একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী নন। "প্রথম শ্রেণীর শিল্পী" বলতে শ্রীরায় যথার্থ কি বোঝাতে চেয়েছেন তা সত্যিই বুঝতে পারলাম না।

অতঃপর শ্রীরায় বলেছেন, টেলরসাহেব ফাউস্তের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুবাদক এবং তিনিই ফাউস্তকে অবিকলভাবে ইংরেজীতে প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু আমি সবিনয়ে শ্রীরায়ের কাছে ইংরেজী ভাষায় 'ফাউস্ত'এর সার্থক অনুবাদক কয়েকজনের নাম পেশ করতে চাই—Anster, Hayward, Macneice ও Shawcross সাহেব। এঁদের মধ্যে কবি Macneice-র অনুবাদটি শ্রীরায়কে পড়তে অনুরোধ করি, অবশ্য যদি পড়া না থাকে। তবে, 'অবিকলভাবে' অনুবাদ কখনও হয় নি, হচ্ছে না ও হবে না। ছন্দ মাত্রা বজায় রাখলেও নয়, ভাবের কথা ছেড়ে দিলেও ধ্বনির প্রশ্ন থেকে যায়। traduttori, traditori.

কোনো মহৎ সৃষ্টিরই যথার্থ ভাষান্তর হয় না। তবু, শ্রীরায়ের উক্তিকে সমর্থন করেই বলছি, অনুবাদ মূল নয়। অনুবাদ "স্বীয় শক্তির প্রয়োগে অন্য ভাষার কাব্যসম্পদের সমীপবর্তী হওয়াই যথেষ্ট প্রয়াসযোগ্য আদর্শ।" অনুবাদকর্মে আমাদের প্রধানত ভাবগ্রাহিতার পৃষ্ঠপোষক হওয়াই উচিত। উচ্চশ্রেণীর বিদেশী সাহিত্য অনুবাদ সম্পর্কে শ্রীগাঙ্গুলী 'ফাউস্তের ভূমিকায়' যে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন (এবং শ্রীরায়ও যার উল্লেখ করেছেন) আমি তার সঙ্গে সর্বতোভাবে একমত। অনুবাদকার্যটি যথাযথ ভাবানুগ হলো কিনা সেটাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। Nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres (Horace, De Arte Poetica, 133) শব্দানুক্রমে অনুবাদে যদি মূল রচনার ভাব যথোচিত প্রকাশ না পায়, সেখানে শব্দের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অসঙ্গত নয়। সুতরাং, শ্রীরায় 'স্বর্গে প্রোলোগ'-এ রাফাএলের ঈশ্বরস্তুতির বাংলা তর্জমা সম্পর্কে যে আপত্তি তুলেছেন তা এক্ষেত্রে নিরর্থক। প্রসঙ্গত, শ্রীরায় বোধহয় বাঙলা-ফাউস্তের 'পরিশিষ্ট'টি লক্ষ্য করেন নি। শ্রীগাঙ্গুলী রাফাএলের ভাষাকে নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তন করেছেন:

ভ্রাতৃসম মহাজ্যোতিষ্কগণ
মণ্ডলমাঝে ধ্বনিছে তপন
গানের দ্বন্দ্বে, আগেরি মতন,
আর সমাপিছে অশনির বেগে
বিহিত আপন বিশ্বভ্রমণ!
দেখি এ-দৃশ্য দেবদূতসার
হয় বলীয়ান,
যদিও বোঝে না তত্ত্ব ইহার
অতি গরীয়ান!

বর্ণনাতীত সৃজন তোমার
আজো অপূর্ব আদির প্রকার
অতি মহীয়ান!

এবার আমি শ্রীগাঙ্গুলীর অনূদিত অসংখ্য সার্থক পংক্তির কতিপয় উদ্ধৃতির মারফৎ দেখাতে চেষ্টা করব যে, জার্মান এবং বাঙলা—এই উভয় ভাষারই বিভিন্ন স্তরে শ্রীগাঙ্গুলীর বৈদগ্ধ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য মনকে আপ্লুত করে।

Vierter
Nach Burgdorf Kommt herauf: Gewiss dort findet ihr
Die Schoensten Maedchen und das beste Bier,
Und Haendel von der ersten Sorte!

মরে যাই! ঐ দেখ,
হাঁটছে ডবকা ছুঁড়ী দেখ,, হাঁটে কিবা ঠাটে ভাই!
ওরে আয়, জোরে আয় উহাদের সাথে মোরা যাই,
তামাকটা কড়া হবে মদ হবে জোরালো বিয়ার,
মেয়ে এক সাজাগোজা পছন্দ এই তো আমার!
(পৃ. ৫১)

Wagner… … … …
Doch gehen wir! Ergraut ist schon die welt,
Die Luft gekuehlt, der Nebel faellt!
Am Abend Schaetzt man erst das Haus.—
… … … … …

ভাগনার:… … … … … …
চলুন এবার,
সন্ধ্যা এলায়েছে তার ধূসর আঁচল,
পবন শীতল,
নামে ঘন কুহেলিকা,
হেনকালে সর্বলোক ভালবাসে গৃহদীপখানি।
(পৃ. ৬৮)

Anster সাহেবের "Towards night we first have the true feel of home" বা, Shawcross সাহেবের 'when evening comes the charms

of home grow double" বা Taylor সাহেবের "At night, one learns his house to prize" এমনকি কবি MacNeice-র "It's in the evening one really values home"-এর চেয়ে শ্রীগাঙ্গুলীর "হেনকালে সর্বলোক ভালবাসে গৃহদীপখানি" বোধহয় অনেক সঙ্গত ও সার্থক পর্যায়ের অনুবাদের দাবি রাখে। প্রসঙ্গক্রমে Taylor সাহেবের পাণ্ডিত্যকে স্বীকার করেই সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, জার্মান 'Abend' শব্দটির পরিবর্তে 'Night' শব্দটির প্রয়োগ কি যথাযথ হয়েছে? এবং মূলের ঝোঁক এক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে কিনা তা বিদগ্ধ পাঠকরাই লক্ষ্য করবেন।

Mephestopheles
Wie's wieder siedet, wieder glueht!
Geh ein und troeste sie du Tor!

মেফিস্তো :
টগ্‌বগিয়ে ফুটল পিরিত, উঠল জ্বলে আবার,—
ওরে পাগল! চল এখন, জুড়াও হিয়া পিয়ার।
(পৃ. ২১১)

'পিরিত' ও 'পিয়ার' শব্দ দু'টির ব্যঞ্জনা চমৎকারিত্বের দাবি রাখে। অনুবাদে মূল রস ও স্বভাবকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছে।

সর্বশেষে শ্রীরায়ের নিজস্ব অনুবাদকাণ্ডের ওপর কয়েকটি কথা বলতে চাই।

Meine Ruh ist hin, ...
Mein Herz ist Schwer,
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr

Taylor সাহেব :
My peace is gone,
My heart is sore:
I never find it,
Ah nevermore!

শ্রীগাঙ্গুলী :
শান্তি আমার বিদায় নিল,
হৃদয় হোল ভার,
শান্তি আমার ফিরবে না তো,
ফিরবে না তো আর!

শ্রীরায় :
শান্তি আমার ছেড়ে গেছে
মন হয়েছে ভার
ফিরে সেটি পাবো না ত
পাবো না ত আর।

শ্রীগাঙ্গুলীর "বিদায় নিল" এবং শ্রীরায়ের "ছেড়ে গেছে"-র ঝোঁক এক নয়। শ্রীগাঙ্গুলীর "বিদায় নিল"-র প্রয়োগ এখানে মূলানুগ এবং যথাযথ। প্রসঙ্গত, শ্রীরায় বোধহয় Taylor সাহেব অনুসরণে উপরি উক্ত গানটির শেষ আট পংক্তি দুটি পৃথক স্তবকে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু, শ্রীগাঙ্গুলী শ্রীরায়ের পংক্তি-বিন্যাস মানেন নি। একটি প্রামাণ্য সংস্করণে উক্ত স্তবক দু-টি একত্রেই পাওয়া যায় :

Mein Busen draengt
Sich nach ihm hin,
Ach duerft' ich fassen
Und halten ihn!
Und kuessen ihn
So wie ich wollt',
An Seinen Kuessen
Vergehen sollt'!
(Goethe. Faust, P. 111)

Bearbeiter Des Bandes
Ernst Grumach
1954
Academic—Verlag Berlin)

তাছাড়া, আলোচ্য স্তবকদ্বয় 'উর্ফাউস্তে'ও পৃথকীকৃত হয় নি।

Mein schoos ! Gott ! draengt
Sich nach ihm hin
Ach duerft' ich fassen
Und halten ihn
Und kuessen ihn
So wie ich wollt
An seinen kussen
Vergehen sollt.

Urfaust, P. 45
Gesamtausgabe
Im Insel-Verlag
1958)

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজেশ্বরী দত্তের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত

'পরিচয়' সম্পাদক সমীপেষু,

পরিচয় পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান ও বাঁট" প্রবন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রাগ-নির্ভরতা সত্ত্বেও তার স্বাতন্ত্র্য নিরূপণে লেখক রবীন্দ্রনাথের অনন্যতার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন এবং অসংযমী গায়কের স্বরচিত অলংকার প্রয়োগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বকীয়তাহানি সম্পর্কে হীরেনবাবুর বক্তব্যে আমার সাধারণ সমর্থন আছে। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গে তিনি এমন একজন শিল্পী সম্পর্কে অন্যায়ভাবে কটাক্ষ করেছেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়কদলে যাঁর স্থান প্রথম সারিতে। শ্রীযুক্ত রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমি উল্লেখ করছি নে (তার কণ্ঠে ধ্রুপদ ও বাংলা খেয়াল শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে তাই তাঁর সম্পর্কে হীরেনবাবুর অশ্রদ্ধাব্যঞ্জক ইঙ্গিত আমার অত্যন্ত অশোভন মনে হয়েছে), কিন্তু শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত সম্পর্কে তার অভিযোগগুলি আদৌ তথ্যসমর্থিত নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের রূপায়নে তিনি রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করে আত্মম্ভরিতার ছাপ রাখেন—এ কথায় তাঁর গানের মনোযোগী শ্রোতা

কখনই সায় দেবে না। 'কিছুই ত হলনা', 'এরা পরকে আপন করে', 'এ মোহ আবরণ'—এ-সব গানে শ্রীমতী দত্ত সুপরিমিত বোলতান এবং বিস্তার প্রয়োগ করেন, কিন্তু সে প্রয়োগ তার অসামান্য দক্ষতা বা সংযমের জন্যই প্রশংসনীয় নয়, আমার নিশ্চিত ধারণা এ-জাতীয় ভাঙা গানে সামান্য বিস্তার ও বোলতান গানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়েছিল। হীরেনবাবু কি শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীমতী নীলিমা সেনের কণ্ঠে 'হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল' বা 'কে বসিলে আজি' টপ্পা অঙ্গের গানে বিস্তার শোনেন নি? হীরেনবাবু শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেকর্ড করা খেয়ালাঙ্গ গান 'বিমল আনন্দে জাগোরে' উল্লেখ করেছেন—সেখানে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠের সুদীর্ঘ তানটির কথা কি তিনি ভুলে গেছেন? এসব প্রয়োগ তো দূষণীয় নয়! তবে শ্রীমতী দত্তকেই দোষী করা হবে কেন? রমেশবাবুর কাছে সাঙ্গীতিক উপদেশ নেন বলে?

ঐ সব গানের রূপায়ণ প্রসঙ্গে রাজেশ্বরী দত্তের সঙ্গে আর সকলের পার্থক্য, শ্রীমতী দত্ত ঐ গানগুলি স্বরলিপি নির্দেশানুযায়ী তাল রেখে গেয়েছেন—যা অন্য কেউ পারেন না (এটা আমার স্বকপোল কল্পনাও নয়, বিদ্বেষপ্রসূত উক্তিও নয়—শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপাপ্ত জনৈক শিল্পী স্বয়ং একথা আমায় বলেছেন)। এ গানগুলি তাল রেখে অথচ বিশেষ মেজাজ (mood)-টি নষ্ট না করে গাওয়া সাধনা সাপেক্ষ—রাজেশ্বরী দত্ত সে সাধনায় সফল হয়েছেন বলে তাকে হেয় করা সমীচীন কি? তাছাড়া তালের সম্পর্কে রাজেশ্বরী দত্ত অনাবশ্যক ব্যস্ততাকে কোথাও প্রশ্রয় দেন নি। যে সব গান আলাপের ঢঙে তালের নিয়মিত বাঁধন না মেনেই গেয়, সে-সব গানে তিনি তো আলাপের ঢঙই রক্ষা করেছেন। কই, 'বন্ধু রহো রহো সাথে' কিংবা 'হে বিরহী হায়' রেকর্ডে রাজেশ্বরী দত্ত কোনো percursion যন্ত্র ব্যবহারই করতে দেন নি। 'বাজে করুণ সুরে' তিনি কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে গেয়েছেন, দিল্লী কেন্দ্র থেকে গত শতবার্ষিকী উৎসবে তার কণ্ঠে 'কখন দিলে পরায়ে' শোনা গেছে, বর্তমানে তিনি ভারতের বাইরে থাকেন, কিন্তু কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রায়ই স্টুডিও রেকর্ডে তার গান শোনানো হয়—'কখন বসন্ত গেল' 'কেহ কারো মন বোঝেনা', 'সকল জনম ভরে',—এসব গানে তবলাবাদ্যের আওয়াজও শোনা যায় না। এমন কি বিখ্যাত উচ্চাঙ্গের গান 'এ পরবাসে রবে কে' গানে মালতী ঘোষালের রেকর্ডে তবলার ব্যবহার আছে,

শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস তবলা সহযোগে তাল রেখে গানটি সর্বত্র পরিবেশন করেন, কিন্তু ঐ গানে রাজেশ্বরী দত্ত তবলার ঠেকার আশ্রয় নেন নি। তবে তাঁর দোষটা কোথায় ?

রাজেশ্বরী দত্তের সঙ্গে অন্যান্য শিল্পীর তৃতীয় "পার্থক্য" হয়তো তার বিশিষ্ট পদ্ধতিতে। কিন্তু এ পার্থক্য যে কোনো দুজন শিল্পীর গায়ন পদ্ধতিতে লক্ষণীয়—কেননা গায়কেরা তো যন্ত্র নন। এটা খুবই ঠিক কথা যে রবীন্দ্রসঙ্গীত-গায়কদের দায়িত্ব 'creative' নয়, 'representational' বা 'interpretive'—কিন্তু representation-এর ক্ষেত্রেও পরিবেশনকারীর ব্যক্তিগত মানসকে চেপে মারা বা ছাঁচে ঢালাই করার অভিলাষ খুব শ্রদ্ধেয় নয়, সবক্ষেত্রে তা সম্ভবও হয় না। সুচিত্রা মিত্র এবং কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাঁদের গায়ন পদ্ধতিতে রাবীন্দ্রিকতা অক্ষুণ্ণ থেকেও ব্যক্তিগত পার্থক্য লক্ষণীয়, সেই পার্থক্য লক্ষণীয় সুবিনয় রায় এবং শান্তিদেব ঘোষের গায়ন পদ্ধতিতে, এমনকি সুবিনয় রায় এবং অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও। পক্ষাবলম্বনকারীরা হয়তো একজনকে সমর্থন করে আরেকজনকে নিন্দাবাদ করে গায়ের ঝাল মেটান, আমার এঁদের প্রায় সকলকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রদ্ধেয় শিল্পী বলে মনে হয়। রাজেশ্বরী দত্ত যদি রবীন্দ্রসঙ্গীতের আন্তরিক চরিত্রকে বিনষ্ট না করেন তবে তাঁকেই বা কেন সন্দেহবানে বিক্ষত করব ? হীরেনবাবুর কুসংস্কারকে খুব ভয় করেন—এটাও এক-জাতীয় কুসংস্কার নয় কি ?

পার্থক্যের কথায় মনে পড়ল একটি বিশেষ গানের কথা—'মরিলো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।' শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন এ গানটি টপ্পার ঢঙে তাল ছেড়ে গান, শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র এবং শ্রীমতী গীতা সেনের রেকর্ড করা এ গানটিতে আড়-খেম্‌টা ছন্দে কীর্তনের রূপ নিয়েছে। খুব সম্ভবত দু-টি রূপই অভ্রান্ত, রবীন্দ্রনাথের একাধিক গান আছে—যার দুটি তিন-টি করে রূপ লভ্য। এখানেও হয়তো পক্ষসমর্থনকারীরা চরম উৎসাহে একে অন্যকে চোখ রাঙান কিন্তু যেহেতু দুটো রূপই রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত এবং খোদ্ শান্তিনিকেতন থেকেই প্রচারিত—অতএব আমাদের কাছে দুটোই গ্রাহ্য—যেমন গ্রাহ্য 'তবু মনে রেখো' গানের দুটো রূপ (দুটো স্বরলিপি আছে)। 'স্বপন যদি ভাঙিলে' গানে ঐ রকম কিছু হয় নি জোর করে বলা যায় কি ?

যেহেতু শিল্পীরা দৈবী মহিমাসম্পন্ন নন, বরঞ্চ মানবিক গুণেরই অধিকারী তাই তাদের মধ্যে সাময়িক দোষের দেখা পাওয়াও অসম্ভব নয়। কোনো একদিন কোনো এক গানে রাজেশ্বরী দত্তের মুদ্রাদোষ প্রাপ্য হতে পারে, কিন্তু সে আকস্মিক দোষ থেকে কোনো শিল্পীই মুক্ত নন—সে ব্যাপারে একজনকে বেছে নিয়ে কটুকাটব্য করা সঙ্গত নয়। চরম অবিদ্যার বশে যারা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বিকৃত করেন তাদের ধিক্কার দেওয়া সঙ্গীত সমালোচকের কর্তব্যের অন্তর্গত হতে পারে—কিন্তু সেই ধিক্কারের আবর্তে একজন দক্ষ ও গুণী শিল্পীকে টেনে নামানো সুবিচারের পরিচায়ক নয়।

ধ্রুব গুপ্ত

আমি ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষ ভক্ত। ১৩৬৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'পরিচয়' মাসিক পত্রিকায় শ্রীহীরেন চক্রবর্তীর লেখা 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান ও বাঁট' প্রবন্ধটি পড়ে অত্যন্ত মর্মাহত হলাম। প্রবন্ধের প্রথমার্ধের বক্তব্য সুচিন্তিত এবং চিত্তাকর্ষক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধ পড়ে শুধু একটি কথাই মনে হলো যে "রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান ও বাঁট" শিরোনামা দিয়ে সম্ভবত ব্যক্তিগত বা দলগত আক্রোশ থেকে সঙ্গীতাচার্য শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি অশিষ্ট সমালোচনাই লেখকের মূল বক্তব্য।

সম্পাদক মহাশয় লেখকের সিদ্ধান্তের বিশদ আলোচনা আহ্বান জানিয়েছেন। তাই পাঠক হিসেবে এবং শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশেষ গুণের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত আছি বলেই আমি এ আলোচনায় যোগ দিতে অগ্রসর হয়েছি।

শ্রীচক্রবর্তী প্রবন্ধের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমেই আক্রমণ করেছেন তানসেন ঘরানার বাহাদুর খাঁর শিষ্য প্রশিষ্যদের—গদাধর চক্রবর্তী, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, যদুভট্ট, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিষ্ণুপুর ঘরানার বর্তমান প্রসিদ্ধ ধারক ও বাহক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য শিষ্য এবং পুত্র সঙ্গীতাচার্য রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

লেখক প্রথমেই একটি হাস্যকর ভুল করেছেন। (১২২০) পৃঃ "অবশ্য এঁর পূর্বে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ শোনার খুব বেশি সুযোগ ঘটে নি। রমেশবাবুর বেশির ভাগ (এমন কি বেতারেও) ধ্রুপদাঙ্গ এবং খেয়ালাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতই

করে থাকেন"। লেখকের এই মন্তব্যে এটুকু ভালো ভাবেই বুঝেছি যে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের ধ্রুপদ গান শোনার সৌভাগ্য লেখকের কখনও হয় নি। আমি হীরেনবাবুকে অনুরোধ জানাচ্ছি—পুরনো বেতার জগৎ সংগ্রহ করলে উনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে নিশ্চিত হবেন যে সঙ্গীতাচার্য শুধু উচ্চাঙ্গের রবীন্দ্র-সঙ্গীতই নয়—ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল ইত্যাদি বিভিন্ন গান উনি বেতার মারফত পরিবেশন করেছেন।

'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে' গানটি আমি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বহুবার শুনেছি এবং বেশির ভাগই গানটি তাঁকে গাইতে হয়েছে শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে। এ ব্যাপারটা শুধু কলকাতায় নয়, কলকাতার বাইরেও লক্ষ্য করেছি; শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে বহুবার উনি এ গানটি গেয়েছেন সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত বিস্তার করে। আমি যা শুনেছি তাতে তানের ব্যবহার খুব অল্প এবং তা গানের সৌন্দর্য এবং মর্যাদা বাড়িয়েছে।

(১২২১ পৃঃ) 'ঝর ঝর বরিষে······হায় গৃহহারা কথাটার শেষ অক্ষরে প্রত্যেক······বোলতান আছে'—গানের বন্দেজ আর বোলতান কি এক? তাহলে 'এ পরবাসে' গানের প্রথমাংশ বা 'সুধা সাগর তীরে' গানের 'হে' কথাটির স্বরকে বোলতান বলব? এ রকম আরো বহু রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে, লিখে শেষ করা যাবে না।

(১২১৭ পৃঃ) লেখকের একটি মন্তব্য সম্বন্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি—"রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, কীর্তন ইত্যাদি সহজ ভাগে বিভক্ত করা মস্ত বড় একটা ভ্রান্তি"—আমার ধারণা যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যই হল ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালাঙ্গ, টপ্পা অঙ্গ, কীর্তনাঙ্গ ইত্যাদি নানা অঙ্গের গান হয়েও তা রবীন্দ্র-সঙ্গীত।

(১২২৫ পৃঃ) হীরেনবাবু রবীন্দ্রসঙ্গীতের আদর্শ সম্বন্ধে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন—"রবীন্দ্র সঙ্গীতের আদর্শ" সম্বন্ধে আর একটু লিখলে বিস্তারিত জানা যেত "আদর্শ"টা কি?

লেখক শুধু শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হন নি, রাধিকাবাবু এবং গোপেশ্বরবাবুর মত গুণী ব্যক্তিকেও কলমের খোঁচায় জর্জরিত করেছেন।

(১২২৭ পৃঃ) শ্রীচক্রবর্তী শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তকে আক্রমণ করেছেন। লেখক 'স্বপন যদি ভাঙিলে' গানটিকে তালবিহীন বলেছেন। কিন্তু সত্যি তা নয়, গানটি একতালে নিবদ্ধ। শ্রীমতী দত্ত অধিকাংশ গানই কঠিন তালে অথচ

সুন্দর ভাবে পরিবেশন করেন—যা কোনো শিল্পীই কখনও গান না। আজকাল অবিশ্যি মাঝে মাঝে এক আধজনকে কঠিন তালে গাইতে দেখা যায়—তবে তা হাতে গোনা যায়। কতকগুলি তালে—যথা যৎ, আড়া ঠেকা, ধামার ইত্যাদি—গান গাওয়া কঠিন নিশ্চয়ই, তবে নিয়মিত অভ্যাসে তা অনেক সহজ ভাবে গানকে সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। একটু কষ্ট স্বীকার করে অভ্যাস করে নিলে তখন আর তালবিহীন গানের কথা মনেই আসবে না—এটা অবিশ্যি আমার ব্যক্তিগত মত। সুর বজায় রেখে তালের সঙ্গে গাইলে গানের বৈশিষ্ট্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না, বরঞ্চ একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে তার মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান ও বাঁট করতে হলে শিল্পীর যথেষ্ট যোগ্যতা থাকতে হবে। যোগ্য শিল্পী তাঁর মর্যাদা নিশ্চয়ই রাখবেন। রাজেশ্বরী দেবী সম্বন্ধে একটি মাত্র মন্তব্যই আমি করব—শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্যা শিষ্যা রাজেশ্বরী দেবীর মতো সুরে, তালে, আত্মবিশ্বাস নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে আর কোনো পুরুষ অথবা মহিলা শিল্পী গাইতে পারেন বলে আমার মনে হয় না—কেন না আজ পর্যন্ত শুনিনি। রাজেশ্বরী দেবী শুধু বাংলা বা ভারতেই নয় সমগ্র বিশ্বে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মর্যাদা বাড়িয়েছেন।

গীতাঞ্জলি দেবী

"রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান ও বাঁট"

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'পরিচয় পত্রিকায়' শ্রীযুত হীরেন চক্রবর্তীর "রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান ও বাঁট" শীর্ষক প্রবন্ধখানি বেশ শ্রদ্ধা নিয়ে পড়লাম। কিন্তু হীরেনবাবুর লেখায় কোথাও আক্রমণ এবং অভদ্রতা ছাড়া অন্য কিছুই পেলাম না। হীরেনবাবু শ্রদ্ধেয় শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিদের উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতসমাজকেই আঘাত করতে চেয়েছেন। রমেশবাবুর অপরাধ, তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান বাঁট ব্যবহার করেছেন। কথাটা কি সত্যি? নিশ্চয়ই না। কারণ রমেশবাবু যে গানগুলো গেয়ে থাকেন, সেগুলো রবীন্দ্র-সঙ্গীত নয়—রবীন্দ্রনাথের গান। রবীন্দ্রসঙ্গীত আর রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান সেইগুলোই, যেগুলোর বাণী রবীন্দ্রনাথের কিন্তু সুর হিন্দুস্তানী খেয়াল ধ্রুপদের। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্ধভক্তরা

যদি বলেন যে রবীন্দ্রনাথ খেয়াল ধ্রুপদের সুর গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু তান বাঁট বর্জন করেছেন—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে তান বাঁট প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন, তাহলে যে, 'যে ধ্রুবপদ দিয়েছো বাঁধি বিশ্ব তানে, মিলাবো তাই জীবন গানে' গানখানি তিনি ভুল করে লিখেছেন। না, তিনি ভুল করে লেখেন নি। মনের সম্মতি ছিল বলেই তিনি লিখেছেন। আর একটি কথা হলো কোনো কোনো হিন্দুস্তানী খেয়াল ধ্রুপদের সুর যদি রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গানের উপযোগী হয় তাহলে সেই সব খেয়াল ধ্রুপদের তান বাঁট এবং লয়ের কাজও রবীন্দ্রনাথের গানের অঙ্গীভূত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তানের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন না। তার একটি প্রমাণ হিসেবে বলছি, 'পিপাসা হায় নাহি মিটিল' গানখানির শুরু থেকেই বেশ বড় তান রয়েছে। হীরেনবাবু হয়তো বলবেন, যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন। তার অতিরিক্ত তিনি বরদাস্ত করতেন না। কিন্তু সঙ্গীতের রাজ্যে এই প্রয়োজন শব্দটির ওজন সবার কাছে এক নয়। যদি তাই হতো তাহলে শার্ঙ্গদেব, অহোবল, ভরত, দত্তিল, মোজার্ট, ষ্ট্রাভেন্সকী, বিথোভেন এবং র‍্যাভেল সব বিষয়ে একই কথা বলে যেতেন; আর বিলাবল ঠাট ডায়াটোনিক উপাধি নিয়ে নিজের চলনভঙ্গিটা সাহেবী করে ফেলতো না, এদেশের 'সা রে গা পা ধা' চীনাদের ঘরে যেয়ে কুঙ, সাঙ, কিয়ো, চী, উ, নাম নিয়ে ভোল পালটে ফেলত না এবং এদেশের বাইশ শ্রুতি আরবের জেক, ডু, সি, সের, পেনি, স্কেস, হেপ, পর্দার দাপটে খতের শ্রুতি হয়ে পড়ত না। কিন্তু দেশের সঙ্গে দেশের এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এই পার্থক্য চিরদিন থাকবে। কারণ অনুভূতি এবং রুচি সব মানুষের এবং সব দেশের এক নয়। হীরেনবাবু হয়তো বলবেন, রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির ওপরে রমেশবাবুর অনুভূতিকে স্থান দেওয়া যায় না। কিন্তু আমি বলবো, এটা ওপর নিচের কথা নয়—অনুভূতি এবং রুচির পার্থক্যের কথা। আর বিখ্যাত সঙ্গীত সমালোচক আরন কপলাণ্ড (Aaron Copland) তাঁর *What to listen for in music* বইখানিতে লিখেছেন—"Don't get the idea that the value of music is commensurate with its sensuous appeal or that the loveliest sounding music is made by the greatest composers. If that were so, *Ravel* would be a greater creator than *Beethoven.*" হীরেনবাবু হয়তো বলবেন, রবীন্দ্রনাথের নবনীত-

ওদের ব্যাকরণে তান বাঁটের স্থান নেই। কিন্তু স্থান আছে কি নেই সে তো 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' গানের সুর, ছন্দ এবং বাণীর দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায়। গানখানির বাণী বিদ্যাপতির এবং সুর রবীন্দ্রনাথের। আর এই গানখানিতে হিন্দুস্তানী গায়কী ছাড়া অন্য কোনোও গায়কী পাওয়া যায় না। অথচ এটাকে বেমালুম রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে চালানো হয়। আর এই গানেও যদি রমেশবাবু দুন চৌদুন করেন তাহলে হীরেনবাবু নিশ্চয়ই ছেড়ে কথাটি কইবেন না। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা এ গানকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বলবেন না, বোস-আইনস্টাইন থিয়োরীর মতো বিদ্যারবী সঙ্গীতই বলবেন। রবীন্দ্রনাথের এরকম অনেক হিন্দুস্তানী ঢং-এর গান রয়েছে যেগুলোর মধ্যে তান বাঁট এবং দুন চৌদুন অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়—একটুও খারাপ লাগবে না। হীরেনবাবু অনেকবার কাব্যসঙ্গীতের দোহাই দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানে তান বাঁট করার অপরাধে শ্রদ্ধেয় ৺রাধিকামোহন গোস্বামী, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেন দত্ত প্রমুখ শিল্পীদের বেশ কয়েক হাত নিয়েছেন। কিন্তু ওঁরা কি হীরেনবাবুর 'তোমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর' ওপর তান বাঁট চাপিয়ে দিয়েছেন? হীরেনবাবুর জানা উচিত, যে গানের বাণী এবং সুর তান বাঁটের উপযোগী নয় সে গানে জোর করে তান বাঁট করা যায় না। তিনি হয়তো আবার পুরনো কথা বলবেন—রমেশবাবু জোর করেই তান বাঁট করেছেন। তাহলে আমিও বলবো, কান যদি ফুটো করলেন তো ঝুমকো পরবেন না কেন? সুরটা যদি একটি খেয়াল গানের কার্বন কপি হয়, তা হলে তান বাঁটগুলোর ওপর বিরক্তি কেন? হীরেনবাবু যুক্তি দেখাবেন হিন্দীভাষার মতো বাংলা ভাষা হিন্দুস্তানী তান বাঁটের ধকল সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তাহলে শ্রদ্ধেয় ৺জ্ঞান গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীদের বাংলা গান এত জনপ্রিয় হলো কি করে? আসল কথা হলো একটি কেত্‌লি যেমন শিশুর কাছে খেলনা, প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে চা তৈরির অপরিহার্য পাত্র এবং বৈজ্ঞানিকের কাছে বাষ্পশক্তি আবিষ্কারের যন্ত্র, তেমনি রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে তান বাঁট ইত্যাদি ও লয়ের কাজ অবোধ, অর্ধজ্ঞানী এবং মহাজ্ঞানী সঙ্গীতানুরাগীর কাছে যথাক্রমে হাসি উৎপাদক, বিরক্তিকর এবং আনন্দদায়ক ক্রিয়া। হীরেনবাবু নিশ্চয়ই বলবেন, রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ হয়েও তান বাঁটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অন্যতম গুরু ৺রাধিকামোহন গোস্বামীর সম্বন্ধে

নীরব ছিলেন কেন? অপরের বেলায় ষ্টিম রোলার চালাতে বারণ করেছেন, অথচ শ্রদ্ধেয় গোস্বামী ষ্টিম, ডিজেল এবং ইলেট্রিক সবরকম রোলার চালিয়েও প্রতিবাদের সম্মুখীন হলেন না! আশ্চর্য! তাহলে রবীন্দ্রনাথ কি পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন?

হীরেনবাবু একজায়গায় "হলক" তানের উল্লেখ করেছেন। শব্দটা "হলক" নয়—"হলকা"। যে তানের প্রতি দুই স্বরের পর তৃতীয় স্বর দু-বার ব্যবহৃত হয় তাকেই "হলকা তান" বলে। শাস্ত্রে আছে—গান্ধার স্বর শান্তরস উৎপাদক; অতএব রমেশবাবু যদি "স্বারে গাগা" তান করেন তাহলে আগুনের হলকা ছুটবে কেন? শ্রীচক্রবর্তী হয়তো বলবেন, ওগুলো পুরনো কথা। তাহলে আমিও বলব, ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—Rabindranath Tagore, the greatest Indian poet of the present age, was also in the old tradition when he composed a song and set it to tune and sang it himself.

হীরেনবাবু আর একজায়গায় সমের ওপর রমেশবাবুর গোঁত্তা মারার কথা লিখেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রামকেলী রাগে 'দুখ দূর করিলে' গানের সমে গোঁত্তা মেরেছেন সেটা বোধহয় হীরেনবাবু স্বরবিতানের পাতা খুলে দেখেন নি। আর এমন অনেক রাগ আছে, যাদের সব স্বর স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ঐ সব স্বর নিজেদের প্রকাশ করতে অন্যস্বরের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে,—যেমন দরবারী কানাড়া রাগে গান্ধার স্বর মধ্যমের সাহায্য ছাড়া দরবারীর রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে না। কাজেই গান্ধারের ওপর 'মম' থাকলে গোঁত্তা একটা মারতেই হবে। এতে যদি হীরেনবাবুর আপত্তি থাকে তাহলে রবীন্দ্রনাথের গানের ওপর থেকে রাগ-রাগিনীর নাম মুছে ফেলতে হবে। রামকেলিতে কোমল নিষাদ গৌণস্বর এবং ওটা কেবল গোঁত্তা মারার কাজেই লাগে। রবীন্দ্রনাথও উল্লিখিত গানে সেই গোঁত্তাই মেরেছেন।

পরিশেষে বলব যে শিল্পী নিপুণ হলে তাঁর তান বাঁট রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ গানে ভালোই লাগবে; আর অনিপুণ শিল্পীর তান বাঁট হিন্দুস্তানী খেয়াল গানেও ভালো লাগবে না। হীরেনবাবু কি রমেশবাবুকে নিপুণ শিল্পী বলে স্বীকার করেন না?

অজিতকুমার

পু স্ত ক প রি চ য়

ক্লিক গ্রহে মানুষ। অদ্রীশ বর্ধন॥ আলফা-বিটা পাবলিকেশনস্॥ টা. ৩.০০

মানুষের মন ডানা মেলতে চায় কল্পনার কল্পলোকে। তার এই কল্পলোক সৃষ্টি করার জন্যই উদ্ভব হয়েছে রূপকথার। রূপকথার রাজ্যে দ্রুতগামী ঘোড়া তাই পরিণত হয় পক্ষীরাজে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, মাটির টান কাটিয়ে, উধাও হয় আকাশ পথে, গরু গাছে চড়ে, পশুপাখি, গাছপালা মানুষী ভাষায় কথা বলে, কেউ-ই তাতে আপত্তি করে না কারণ রূপকথার কল্পনায় এইটাই স্বাভাবিক। কীট-পতঙ্গ, পশুপাখি, গাছপালা, লতাপাতা, ফুল-ফল সব কিছুরই সঙ্গে কল্পনার মাধ্যমে মানুষ এক হয়ে যেতে চায় রূপকথার জগতে। এই হিসাবে রূপকথার জগৎ হল চিন্ময়, তার আহ্বান হলো বিশ্বলোকের সঙ্গে একাত্মবোধের আহ্বান। প্রাকৃতিক রহস্য সম্পর্কে মানুষের অজানা বিস্ময়কে আশ্রয় করেই প্রথমত রূপকথার জগৎ গড়ে উঠেছিল। তারপর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক রহস্যের মানসিক অনুধাবনের মাত্রা যতই বেড়ে চলেছে ততই সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর হয়ে আসছে রূপকথার জগৎ। এই কালান্তরের ফলে বিশ্বলোকের সঙ্গে একাত্মবোধের উন্মাদনা, কল্পলোকে মন-বিহঙ্গের উধাও হবার বাসনা কিন্তু বিন্দুমাত্রও কমেনি। এই উন্মাদনা, এই বাসনাই রূপকথাকে আজ রূপান্তরিত করেছে বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীতে। বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে মানুষের মন আজ পৃথিবী ছাড়িয়ে উধাও হয়েছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, ছায়াপথ থেকে ছায়াপথে, পক্ষীরাজ রূপান্তরিত হয়ে গেছে রকেটবাহিত মহাকাশ যানে, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর জায়গা নিয়েছে 'ইলেকট্রনিক ব্রেন' আর 'মেমারি মেশিন' দৈত্য, দানব, রাক্ষস, খোক্কস রূপান্তরিত হয়েছে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে, রেডিও চালিত রবটে। সাধারণত বিজ্ঞানাশ্রয়ী গল্পকথার ভিত্তিভূমি হয় এমন-সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তথ্য যাদের ব্যবহারিক প্রযুক্তিগত সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে এই সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার বাস্তব রূপায়ন আপাত অকল্পনীয়, অভাবনীয় হওয়া সত্ত্বেও ভবিষ্যতে এদের বাস্তব রূপপরিগ্রহণ, বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে অসম্ভব নয়,

উদ্ভট নয়। বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনীতে তাই বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ কল্পনার স্থান আছে তা সে এই কল্পনা যতই অসম্ভব হোক না কেন। বিজ্ঞানাশ্রয়ী কথা কাহিনীতে কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বা অবাস্তবতার কোনো ঠাঁই নেই। বর্তমানের বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পকথা আর আদিম যুগের রূপকথার মধ্যে তফাৎটা বোধকরি এইখানে। বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনীকার বৈজ্ঞানিক তথ্যের, সত্যের বর্তমান বাস্তবতাকে আশ্রয় করে যত নিপুণভাবে বিজ্ঞানাশ্রয়ী কল্পনার জাল বুনতে পারবেন, আপাত বাস্তবতার পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারবেন ততই তাঁর রচনা সার্থক হয়ে উঠবে, রসোত্তীর্ণ হবে। সাধারণত বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনীর মুখ্য উপাদান হলো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, তথ্য সত্য আর এই যন্ত্রপাতি, তথ্য, সত্যকে আশ্রয় করে পৃথিবীর মানুষ, গ্রহান্তরের মানুষ, প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তু গাছপালা নিয়ে মূল কাহিনীটি গড়ে ওঠে।

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক তথ্য, সত্যকে আশ্রয় করে দেশবিদেশের সাহিত্যে বিজ্ঞানাশ্রয়ী কথা কাহিনীর প্রচলনও তত বাড়ছে। বাংলা সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

প্রধানত বিদেশী ভাষায় লিখিত বইয়ের অনুবাদের মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যের পাঠকরা বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনীর সঙ্গে এ পর্যন্ত পরিচিত হয়েছেন, বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতম এই বিভাগে মৌলিক রচনা বড় একটা চোখে পড়ে না, প্রায় নেই বলাই ভাল। বাংলা সাহিত্যের বিজ্ঞানাশ্রয়ী আখ্যায়িকা সম্ভারে আধুনিকতম সংযোজন হলো আদ্রীশ বর্ধনের লেখা "মিলক গ্রহের মানুষ"। বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বইটি লেখকের মৌলিক রচনা, অন্য কোনো বিদেশী বইয়ের অনুবাদ নয়।

মিলক হলো একটি কাল্পনিক গ্রহ। প্রায় পৃথিবীর মতোই এর ভূ-সংস্থান, জলবায়ু, গাছপালা পশুপাখি। এর অধিবাসীরা প্রায় মানুষের মতো। পৃথিবী থেকে মিলক গ্রহের দূরত্ব হলো কয়েক আলো বছর। মিলক গ্রহের অধিবাসীদের কিছু সংখ্যক লোক একসময় আকস্মিকভাবে তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত-জনিত বিকীরণের বলি হয়েছিল এবং এই বিকীরণের প্রভাবে তাদের বংশগতিধারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই পরিবর্তনের ফলে কালক্রমে তাদের বংশধরেরা পরিণত হয় একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা শ্রেণীতে। লেখক এই বিশেষ

শ্রেণীটির নাম রেখেছেন "মিউপা"। মিউপাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের হার অত্যন্ত দ্রুত, পাঁচ বছর বয়সের একজন মিউপা বুদ্ধিবৃত্তিতে বিশ বছরের যুবকের মতো। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেও মিউপারা সাধারণ মিলকবাসীদের চেয়ে অনেক উন্নত। মিউপাদের শ্রেণীগত পেশা হলো রাজনীতি। মিলক গ্রহের শাসনব্যবস্থা পরিচালনায়, সাধারণ মিলকবাসীদের জীবনমরণ নিয়ন্ত্রণে মিউপাদের নিব্যূঢ় স্বত্ব। শ্রেণীগত নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের চরম রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক অপব্যবহার করতে মিউপাদের দ্বিধা নেই বিন্দুমাত্রও। সাধারণ মিলকবাসীদের বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ বয়ঃপ্রাপ্তির সমানুপাতে যাতে না ঘটে হরমোন নির্যাসের সাহায্যে মিউপারা তার ব্যবস্থা করতে ভোলে না এর ফলে মিলক গ্রহের সাধারণ অধিবাসীরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হয় জড়বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক বালকে, সাদা কথায় 'বুড়ো-খোকায়', যৌবনেই অকাল-বার্ধক্যে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। মিলক গ্রহের সাধারণ অধিবাসীরা মিউপাদের শোষণ-শাসন, রাজনৈতিক পীড়নমূলক ব্যবস্থাগুলি যাতে নির্বিবাদে অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করে সেই উদ্দেশ্যে মিউপারা তৈরি করে বিদ্যুৎচালিত বিরাট এক যান্ত্রিক মগজ আর এই যান্ত্রিক মগজের প্রতিভূ হিসাবে চালিয়ে যায় তাদের শাসন-শোষণ। যান্ত্রিক মগজের মারফৎ তারা জারি করে তাদের যত পীড়নমূলক বিধিনির্দেশ। মিলকের সব রাজনীতিবিদই হলো মিউপা। মিউপাদের রাজনৈতিক শিখণ্ডী-বৃত্তি, যান্ত্রিক মগজের বুজরুকি মিলকের অবোধ জনসাধারণ ধরতে পারে না। বালকোচিত সারল্যে মিলকের সাধারণ অধিবাসীরা যান্ত্রিক মগজ যা বলে অন্ধভাবে তাই মেনে চলে। যান্ত্রিক মগজই হলো মিলকের ঈশ্বর, জনগণ-নায়ক বিধাতা। মিলকবাসীদের সব সমস্যার সমাধান করে দেয় যান্ত্রিক মগজ। মগজের সামনে শুধু প্রশ্নটা বললেই হলো, তার পরে মগজের যন্ত্রের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে নির্ভুল উত্তর। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, অবস্থা বিশেষে আইনকানুনের পরিবর্তন, কখন কোন মিলকবাসীকে পরলোকে পাঠানো দরকার সবই বলে দেয় মগজ অর্থাৎ মিউপারা যা চায়, মগজ সেই নির্দেশই দেয়। মগজের পিছনে বসে মাইক্রোফোনের মারফৎ মিউপা রাজনীতিবিদেরা মগজের নির্দেশ দেয়। এ মেশিন ছাড়া মিউপাদের এক পাও এগোবার ক্ষমতা নেই মিলক গ্রহের মানুষদের। মগজ কি করে চলে এবং মগজের নির্দেশের নির্ভুলতা সম্পর্কে মগজের সামনে প্রশ্ন করা বা তোলা মিলকগ্রহে মারাত্মকভাবে

নিষিদ্ধ। মগজ যা বলে অন্ধভাবে তাই মেনে না চললে মিলক গ্রহের আইনে বাঁচা যায় না। অবধারিত মগজ কিভাবে চলে বা মগজের নির্দেশ নির্ভুল কি না এই প্রশ্ন যারা তোলে মিলক গ্রহে তাদের কাউকে বাঁচতে দেওয়া হয় না। মিউপারা যান্ত্রিক মগজের সাহয্যে মিলক গ্রহের সাধারণ অধিবাসীদের এইভাবে অধীনে রেখে ছিল বংশ পরম্পরাক্রমে। তারপর একদিন পৃথিবী থেকে রকেট চালিত মহাকাশ যানে করে একজন রাশিয়ান, একজন ভারতীয় এবং একজন মার্কিন মহিলা নিয়ে গঠিত মহাকাশ অভিযাত্রীর একটি আন্তর্জাতিক দল উপস্থিত হ'ল মিলক গ্রহে। মিউপারা এই অভিযাত্রী দলটিকে বন্দী করে। পৃথিবীর মানুষের তৈরী রকেট বাহিত মহাকাশযান দেখে মিউপারা যেমনভাবে কারো সন্দেহ না জাগিয়ে মিলক গ্রহের অধিবাসীদের শাসনে শোষণে রেখেছে ঠিক তেমনি ভাবে বিরাট এক রকেট বাহিনী তৈরী করে তার সাহায্যে অন্যান্য গ্রহে আধিপত্য বিস্তার করবার, অন্যান্য গ্রহবাসীদের পদানত করবার এক পরিকল্পনা করে। এই উদ্দেশ্যে মিউপারা পৃথিবী থেকে আসা অভিযাত্রী দলের কাছ থেকে শিখে নিতে চায় রকেট বাহিত মহাকাশযান নির্মাণের কৌশল, মহাকাশ যান চালনার পদ্ধতি। মহাকাশ যান নির্মাণ ও চালনার পদ্ধতি আয়ত্ত করার পর অভিযাত্রী দলটিকে হত্যা করার সিদ্ধান্তও মিউপারা নেয়। মিউপাদের এই ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। জীবন, স্বাধীনতা আর রকেট বিমানের বিনিময়ে পৃথিবীর সর্বনাশ করতে, পৃথিবীকে বিকিয়ে দিতে অভিযাত্রী দলটি কিছুতেই রাজি হয় না। যান্ত্রিক মগজের মারফৎ মিউপারা অভিযাত্রী দলটিকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করে। কূটনীতি আর বুদ্ধি কৌশলে অভিযাত্রী দলটি অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা তো করলেনই উপরন্তু যান্ত্রিক মগজটিকে বিস্ফোরক আর রেডিও চালিত ফিউজের সাহায্যে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন, সাধারণ মিলকবাসীদের কাছে মিউপাদের শ্রেণীস্বার্থে প্রণোদিত রাজনৈতিক পীড়নের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তাদের সাহায্যে সবংশে মিউপাদের বিলুপ্ত করে দিলেন, অভিযাত্রীদের সাহায্যে হরমোন নির্যাসের প্রয়োগে মিলক গ্রহের সাধারণ মানুষেরা তাদের স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি, বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পথ জানতে পারল এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সুপ্রতিষ্ঠিত হল। সংক্ষেপে এই হ'ল 'মিলক গ্রহের মানুষে'র মূল আখ্যায়িকা।

মিউপাদের কাহিনী কল্পনায়, মিউপাদের সঙ্গে পৃথিবী থেকে আসা মহাকাশ অভিযাত্রী দলের সংঘর্ষের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক বহুল প্রচলিত রোমাঞ্চ লেখার

রীতি অবলম্বন করেছেন ফলে বইটি সুখপাঠ্য হলেও রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি। বইটিতে কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য ঘটিত অসংগতি এবং অসম্পূর্ণতা আছে। লেখকের কল্পিত মিলক গ্রহটির দূরত্ব পৃথিবী থেকে অনেক আলোকবর্ষই যদি হয়, তাহলে ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল বেগে চললে (পৃ ১৩) পৃথিবী ছাড়ার বছরের মধ্যে মিলক গ্রহে পৌছন যায় কি ভাবে? কারণ: ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল বেগে চললে এক আলোক বর্ষ অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ সাতাশি হাজার আটশো কোটি মাইল (পৃ ৩০) অতিক্রম করতেই তো দুশো সত্তোর বছর কেটে যাবে! বিজ্ঞান ইথারের অস্তিত্ব আজকাল স্বীকার করে না অথচ লেখক চিন্তার সূত্রের মাধ্যম হিসাবে ইথারের উল্লেখ করেছেন! এই ধরনের বৈজ্ঞানিক তথ্য ঘটিত অসঙ্গতির আরও দু একটি নিদর্শন বইটিতে পাওয়া যাবে। অল্প কয়েকটি ছাপার ভুলও আছে।

বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল মানব কল্যাণ। স্বার্থান্বেষীদের হাতে পড়ে শাসন, শোষণ, নিপীড়নের হাতিয়ার হিসাবে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে পাঠকদের লেখক সচেতন করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা অভিনন্দন যোগ্য। "মিলক' গ্রহের মানুষ"-এর মতো মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আরও সুখপাঠ্য, আরও সার্থক ও রসোত্তীর্ণ বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনী ভবিষ্য লেখকের কাছ থেকে আশা করি। বইটির ভাষা সাবলীল, ছাপা, বাঁধাই, এবং কাগজ ভাল, প্রচ্ছদাবরণীটিও সুন্দর।

পিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরে সানাই বাজুক॥ কাহিনী: কোডাওয়াটিগান্টি কুটুম্বরাও। অনুবাদ: বোম্মানা বিশ্বনাথম্। প্রকাশক: শ্রীঅধীর রায়চৌধুরী। দাম: দু' টাকা।

তেলেগু ভাষায় রচিত এই উপন্যাসটির কাহিনী গড়ে উঠেছে একটি পতিতা নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের সংগ্রামকে আশ্রয় করে। জীবনের বিচিত্রতর পরিবেশে বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতে নায়িকা শান্তার একটি সম্পূর্ণ চিত্র উপন্যাসটিতে পাওয়া যাবে। ভাস্কর রাও, বিশ্বম প্রভৃতি চরিত্রগুলির কাহিনীগত মূল্য কতখানি তা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও, এরা যে শান্তার জীবনের কতকগুলি বিশেষ দিকের সার্থক প্রক্ষেপণে সাহায্য করেছে একথা অনস্বীকার্য।

কোডাওয়াটিগান্টি কুটুম্বরাও অন্ধ্রের অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্যিক। কিন্তু

বর্তমান কাহিনীর উপজীব্য যে সমস্যা তাকে আজ নয়, অন্ততঃ তিন দশক আগে বোধকরি আধুনিক বলা চলতো।

অনুবাদ মন্দ নয়। প্রচ্ছদপট গ্রন্থটির ব্যবসায়িক মূল্য কিঞ্চিৎ বাড়াতে পারে মাত্র।

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

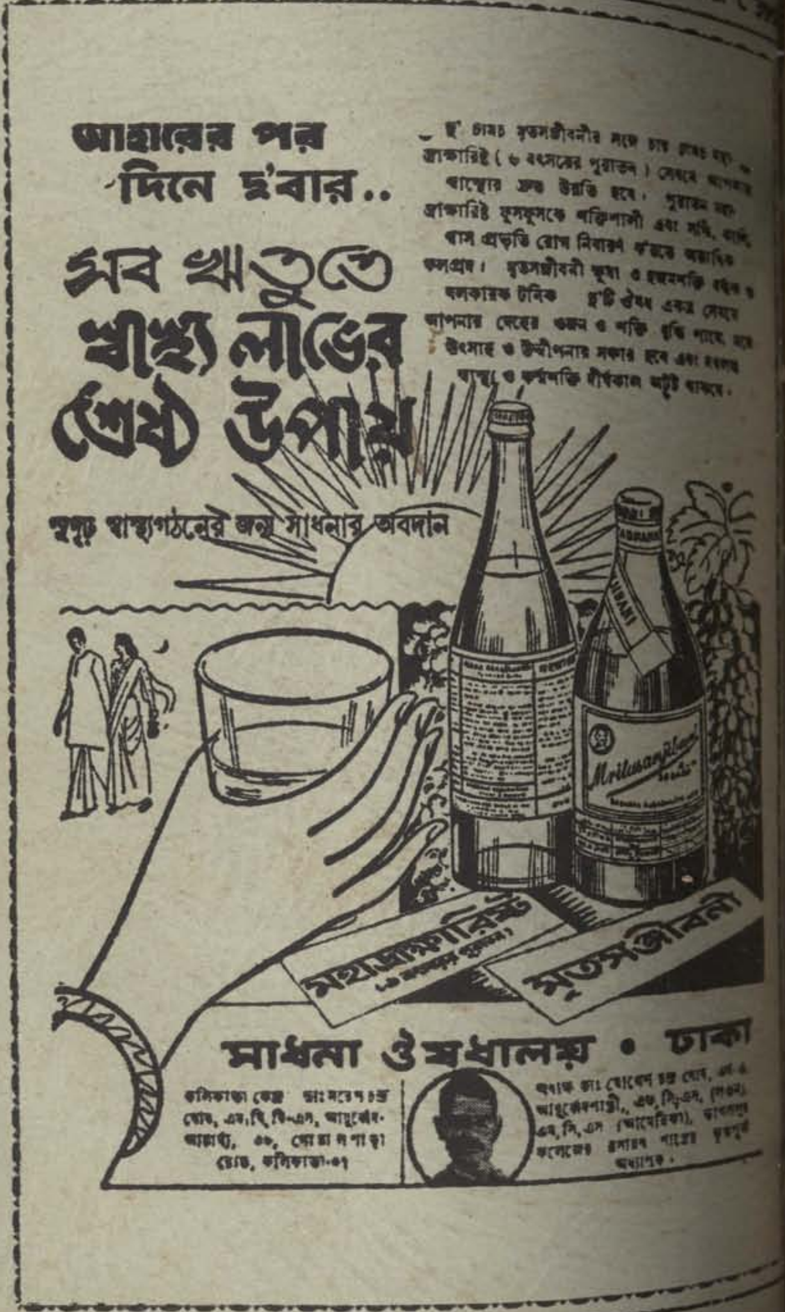
একটি প্রেমের কাহিনী॥ গুড়িপাটি ভেঙ্কট্চলম্। অনুবাদ: বোম্মানা বিশ্বনাথম্। প্রকাশ: মণ্ডল বুক হাউস। দাম: ছ' টাকা।

অন্ধ্রদেশের প্রবীণ সাহিত্যিকগণের অন্যতম ভেঙ্কটচলনের তেলেগু ভাষায় রচিত উপন্যাস 'ময়দানম্' এর বাংলা অনুবাদ আলোচ্য গ্রন্থটি। গোঁড়া হিন্দু পরিবারের একটি মেয়ে ও 'আমীর' নামক জনৈক মুসলমান যুবকের প্রেম এই উপন্যাসের উপজীব্য। দয়িতের জন্যে শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে আত্মীয় স্বজন সংসার, সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়েছে। কিন্তু এই মহান ত্যাগের আকস্মিক পরিণতি বিয়োগান্ত। কারণ, ইতোমধ্যে আমীরের প্রতি নায়িকার প্রেম রূপান্তরিত হয়েছে নবাগত সুলেমানের তরুণ দেহশ্রীর প্রতি দুর্বার আকর্ষণে। অবশেষে আমীর এই ত্রিমুখী প্রেমের অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিদায় নিলো আত্মহত্যা করে।

অনূদিত এই উপন্যাসটির মূল আকর্ষণ কাহিনীর অভিনবত্ব নয়, এর অপূর্ব কাব্যসুষমামণ্ডিত ভাষা ব্যবহার।

প্রচ্ছদ ও ছাপা দেখে মনে হয় বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে উপহারদাতাদের কাছে এ জাতীয় গ্রন্থ যোগ্য সমাদর পাবে।

চিন্ময় গুহঠাকুরতা


আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
সুস্থ স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা



পরিচয়

১৩৬৯